ষোড়শ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

মূল্য এক টাকা

মূর্ছিতা শ্রীরাধা

প্রাচীন চিত্র । কাংড়া কলম

বিশ্বভারতী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক

স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতি, সে যে নিশিদিন
বর্তমানেরে নিঃশেষ করি
অতীতের শোধে ঋণ।

Memory, the priestess, kills the present
and offers its heart to the shrine of the dead past.

২

শান্তি নিজ আবর্জনা দূর করিবারে
ঝাঁট দিতে থাকে বেগে— ঝড় কহে তারে।

When peace is active sweeping its dirt it is storm.

৩

চাহিছে কীট মৌমাছির
পাইতে অধিকার,
করিল নত ফুলের শির
দারুণ প্রেম তার।

Flower, have pity for the worm, it is not a bee:
its love is a blunder and a burden.

৪

সখার কাছেতে প্রেম চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি চাহে শয়তান।

God seeks comrades and claims love,
the Devil seeks slaves and claims obedience.

৫

হিতৈষীদের স্বার্থবিহীন অত্যাচারে
পীড়িত ধরণী বেদনাভারে।

The world suffers most
from the disinterested tyranny
of its well-wishers.

৬

কাঁটার সংখ্যা ঈর্ষাভরে
ফুল যেন নাহি গণনা করে।

The flower which is single
need not envy the thorns
that are numerous.

৭

দোয়াতখানা উলটি ফেলি
পটের 'পরে
'রাতের ছবি এঁকেছি' ব'লে
গর্ব করে।

To justify their own spilling of ink
they spell the day as night.

৮

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধুলার 'পর—
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।

With the ruins of terror's triumph
children build their doll's house.

৯

অস্তরবিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তরে বাকি রহে
পাণ্ডুবরন হাসি।

The cloud gives all its gold
to the departing sun
and greets the rising moon
with only a pale smile.

১০

ফাগুন কাননে অবতীর্ণ
ফুলদলে পথ করে কীর্ণ।
অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি,
নিমেষে নিমেষে অনাসৃষ্টি।

Spring scatters the petals of flowers
that are not for the fruits of the future,
but for the moment's whim.

১১

অপাকা কঠিন ফলের মতন
কুমারী, তোমার প্রাণ
ঘনসংকোচে রেখেছে আগলি
আপন আত্মদান।

Maiden, thy beauty is like a fruit
which is yet to mature
tense with an unyielding secret.

১২

যে ঝুম্‌কোফুল ফোটে পথের ধারে
অন্যমনে পথিক দেখে তারে।

সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

The voice of wayside pansies
that do not attract the careless glance
murmurs in these desultory lines.

১৩

গানখানি মোর দিনু উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামখানি বাদ দিয়ে।

Leave out my name from the gift
if it be a burden but keep my song.

১৪

মানুষেরে করিবারে স্তব
সত্যের কোরো না পরাভব।

১৫

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে,
ভাবিছ বসে সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে।

বর্তমান স্বাক্ষর-পদাবলীর মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ কবিতা-কয়টি যে পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে সেটি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী -কর্তৃক অনুলিখিত কবির এরূপ অন্যান্য 'স্বাক্ষরে' পূর্ণ— অনেকগুলি যথাযথরূপে বা সামান্য পরিবর্তনে লেখনে মুদ্রিত আছে, কতকগুলি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত স্বাক্ষরসমূহের অন্য সকল রচনাই শ্রীঅমিয়কুমার সেন রবীন্দ্রসদনের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন করিয়া দেন— ইহার মধ্যে কতকগুলির ইংরেজি অংশটুকু মাত্র লেখনে পাওয়া যাইবে, কতকগুলির বাংলাও রূপান্তরে উক্ত কাব্যগ্রন্থে বা স্ফুলিঙ্গে বর্তমান, আর অধিকাংশ ইংরেজি সুভাষিতই রবীন্দ্রনাথের Fireflies (1928) গ্রন্থে মুদ্রিত।

রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

রামমোহন রায় মূলতঃ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকরূপে এ দেশে সুপরিচিত হলেও তাঁর নিজস্ব ধর্মমত এবং ধর্ম-সাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা এখনও হয়নি। গোষ্ঠীগত ভাবে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন নায়কের চিন্তাধারা ও সাধনা নানাভাবে তাকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। এর আদিরূপের সঙ্গে সাম্প্রতিক রূপের তাই স্বভাবতঃ বিস্তর প্রভেদ। ধর্মসমাজের ইতিহাসে ধর্মের এই-জাতীয় পরিবর্তন বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী। আদিম খ্রীষ্টধর্ম ও বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম, আদিম বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম, প্রাথমিক যুগের শিখধর্ম ও উত্তরকালের শিখধর্মের[১] রূপভেদকে এই বিষয়ে ঐতিহাসিক উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। সুতরাং কোনও ধর্মসমাজের ইতিহাসে উক্ত ধর্মের বিভিন্ন নায়কের ব্যক্তিগত ধর্মমত স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবার একটি বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে। তার ফলে কেবল যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে আলোচ্য ব্যক্তির একটি জীবন্ত ও সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তাই নয়; সামাজিক মতবিবর্তনে নির্দিষ্ট দেশকালে ব্যাখ্যাত তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারার কতটা রক্ষিত, কতটা বা উপেক্ষিত হয়েছে সেটি নির্ধারণ করাও সহজ হয়। বর্তমান নিবন্ধে রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত ধর্মাদর্শের একটি দিককে এমনি ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

রামমোহন তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে ধর্মত্যাগী ও সমাজদ্রোহী বলে যতই নিন্দিত হয়ে থাকুন-না কেন, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব সম্পর্কে নিঃসংকোচ গর্ববোধ তাঁর চরিত্র ও কর্মধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এর উদাহরণ তাঁর রচনায় প্রচুর ছড়িয়ে আছে, দু-একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। জনৈক খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে রামমোহনের তর্কবিতর্কের মধ্যে তাঁর প্রতিপক্ষ উন্নাসিকতার সঙ্গে এমন উক্তি করেন যে, যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের কৃপায় ভারতীয়গণ ব্যক্তিস্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছেন এবং তাঁদের জ্ঞানোদয় হচ্ছে (the rays of intelligence now beginning to dawn on them), সেই খ্রীষ্টীয়গণের ধর্মকে আক্রমণ করা ভারতবাসীর পক্ষে চরম অকৃতজ্ঞতার সূচক। প্রত্যুত্তরে রামমোহন সগর্বে বলেছিলেন[২]: "If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with the respect to Science, Literature or Religion, I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners." এই প্রসঙ্গে আমরা এও মনে রাখতে

পারি, তিনি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত ব্লোয়ার বিশপ আব্বে গ্রেগোয়ারের নিকট একসময়ে বলেন, হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার সমতুল্য কোনও কিছু তিনি ইউরোপীয় দর্শনে দেখতে পান নি (he has found nothing in European books equal to the scholastic philosophy of the Hindus)[৩] ; তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম-আন্দোলন এবং তাঁর সংস্থাপিত ধর্মসমাজের সংগঠনও তাঁর উপরি-উক্ত বিশিষ্ট মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য, মনীষা ও ঐক্যদৃষ্টির ফলে তিনি ইসলাম খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতির সারসত্যকে প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অর্থে তাঁর ধর্মমতকে অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করাই সংগত। তিনি নিজে তাঁর অনুরাগী শিষ্য নন্দকিশোর বসু, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতির নিকট নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এই-জাতীয় উক্তিই করেছিলেন বলে জানা যায়।[৪] ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের *Calcutta Review* পত্রিকায় কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায় সম্পর্কে যে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন,[৫] সেখানেও তিনি রামমোহনকে বৈদান্তিক বা অন্য কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তরূপে চিত্রিত না করে সার্বভৌম একেশ্বরবাদী বলেই অভিহিত করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মজীবনের প্রথম পর্বে সম্ভবতঃ রামমোহনের ধর্মমতকে পূর্ণমাত্রায় বৈদান্তিক মত বলেই মনে করতেন। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে শ্রাদ্ধবিধি সম্পর্কে সংবাদপত্রে তাঁর যে বাদানুবাদ হয়, তার মধ্যে এর পরোক্ষ প্রমাণ আছে। স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধে যদিও দেবেন্দ্রনাথ প্রতীকোপাসনা-মূলক কোনও অনুষ্ঠান করেন নি, তথাপি দানোৎসর্গ প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন "জাস্টিসিয়া" ছদ্মনামে ১৮৪৬ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে দেবেন্দ্রনাথকে তীব্র সমালোচনা করে ইংরেজি ভাষায় *Englishman* কাগজে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্র ১৭৬৮ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে প্রসঙ্গতঃ জাস্টিসিয়া বা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলেছেন :[৬] "You give out ostensably that your object is to perpetuate the impulse given to Native Society by Rammohun Roy ; you have spoken strongly from the Vedantic pulpit against the reviewer of Rammohun Roy's life in the *Calcutta Review* ; you had aimed at correcting what you apprehended to be the errors and animadversions of that writer ; you said that Rammohun Roy was strictly speaking a Vedantist ;· ·" এই বিতর্কের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নি। যেহেতু রামমোহনও শাস্ত্রের অভ্রান্ততা স্বীকার করে নিয়েই তাঁর ভারতীয় শাস্ত্রবিষয়ক বিচারগ্রন্থগুলি লিখেছেন, সেই জন্য রামমোহনের ধর্মমত বেদান্তভিত্তিক এ বিশ্বাস তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের এবং দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক কিশোরীচাঁদের পূর্বোক্ত মত সমালোচনার অর্থ এখানেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন অক্ষয়কুমার দত্তের সমালোচনা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের ফলে বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজ থেকে দূর হল, তখন ক্রমশঃ রামমোহনের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল। ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাংবৎসরিক উৎসবের যে বক্তৃতা ১৭৭২ শকাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে। রামমোহন সম্পর্কে উক্ত রচনায় বলা হয়েছে :[৭] "তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রকে পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং তদীয়

আলোচনা এবং তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারকালে স্বদেশীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, সেইরূপ মোসলমানদিগের সহিত বিচারকালে কোরাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন কারণ সত্যস্বরূপ মহারত্ন সর্বস্থান হইতেই লভনীয়। এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বি ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনাস্থান এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্মপ্রচারের অভিলাষ ছিল তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম।" রামমোহনের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্তকে এখানে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। নবপ্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের জন্য রামমোহন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ (দ্বারকনাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ ঠাকুর) যে ট্রাস্টডীড প্রণয়ন করেন তাতেও দেখা যায় জাতিধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে একেশ্বরবাদিগণের একটি উপাসনালয় রূপে ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল।[৮] কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের এই অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমত্ব সত্ত্বেও এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়, রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের ধর্মানুষ্ঠানকে মুখ্যতঃ ভারতীয় এবং হিন্দু রূপ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রাথমিক যুগের অনুষ্ঠানাদির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি, তখন সামাজিক উপাসনার মুখ্যতঃ তিনটি ভাগ ছিল: প্রথমতঃ একটি কুঠরিতে কেবল ব্রাহ্মণগণের উপস্থিতিতে বেদপাঠ; তার পরে প্রকাশ্য হলঘরে সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে উপনিষদ্ পাঠ এবং বেদান্ত ব্যাখ্যা; সর্বশেষে ব্রহ্মসংগীতের পর সভা ভঙ্গ।[৯] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন প্রকাশ্যে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যাদি হত তখন সেখানে অহিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিত থাকবার কোনও বাধা ছিল না। মধ্যে মধ্যে মুসলমান ও ফিরিঙ্গী বালকগণকে দিয়েও স্তবগান করানো হয়েছে এমন উল্লেখও পাওয়া যায়।[১০] ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কিছুকাল রামমোহন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদিগণের (Unitarians) উপাসনালয়ে যাতায়াত করতেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মানুষ্ঠানবিধির পর্বগুলিকেও রামমোহন সেই অভিজ্ঞতা থেকে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সংঘের সামাজিক উপাসনার (Congregational Worship) বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুকরণে সজ্জিত করেন। বাইবেল পাঠ, ব্যাখ্যা ও উপদেশ (Sermon) এবং সংগীত, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগত উপাসনার এই ত্রিপর্বের সংশোধিত রূপ আমরা দেখি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের উপাসনাপদ্ধতির শ্রুতিপাঠ, বেদান্ত ও উপনিষদ্ ব্যাখ্যান এবং ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে। কিন্তু বহিরঙ্গের এই সাদৃশ্য ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ধর্মানুষ্ঠানে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ছিল না। রামমোহন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গড়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই ভারতীয় শাস্ত্র এবং ভারতীয় ব্রহ্মবাদকেই তাঁরা ধর্মপ্রচারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। সার্বভৌম একেশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এই স্পষ্ট স্বাদেশিকতা এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান রামমোহনের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে তাঁর স্বাজাত্যবোধের যে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা যে তদানীন্তন কলিকাতার একেশ্বরবাদী এবং ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের বিশেষ উদ্বেগ ও বিরক্তির কারণ হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১১] এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকারের উক্তি স্মরণীয়:[১২] "রাজা তাঁহার জীবন ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজে হিন্দুভাবে হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। তথাচ তিনি অন্য ধর্মের গৌরব সুস্পষ্ট-

ভাবে অনুভব করিতেন। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত তাঁহার হৃদয়কে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই।"

রামমোহনের ধর্মসাধনার এবং ধর্মসংগঠনের এই ভারতীয় ভিত্তিকে মনে রাখলে তাঁর শাস্ত্রবিচারের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌম একেশ্বরবাদের আদর্শ এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রেখে ভারতীয় হিন্দুসমাজকে ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের দিকে ফেরানো এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সামাজিক উপাসনায় ব্যবহারহেতু তিনি প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রকেই অবলম্বন করেছিলেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ এবং পরবর্তীকালের ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা, হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রের এই প্রস্থানত্রয়ের সূত্রেই তিনি প্রথম যুগে ব্রাহ্মসমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের শৈশবাবস্থায় 'ব্রাহ্ম' শব্দটির ব্যবহার নবগঠিত মণ্ডলীর মধ্যে যদিও ছিল, তথাপি 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' বলে এই নূতন মত যে সমধিক পরিচিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য।[১৩] রামমোহন-রচিত গ্রন্থতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা অথবা বেদান্তসম্পর্কীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির সংস্করণ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। 'বেদান্তগ্রন্থ' নামক পুস্তকে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন; 'বেদান্তসার' উক্ত গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত রূপ; ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য, এই পাঁচখানি উপনিষৎ বাঙ্‌লা ব্যাখ্যা সমেত তিনি প্রকাশ করেছেন। শোনা যায় তিনি 'ছান্দোগ্য' এবং 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্‌ দুখানিও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু এগুলি খুঁজে পাওয়া যায় নি।[১৪] তা ছাড়া তিনি সমগ্র ভগবদ্‌গীতার বাংলা পদ্যানুবাদ করেন এবং 'শারীরক মীমাংসা' শীর্ষক ব্রহ্মসূত্রের সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক মুদ্রিত করে প্রচার করেন। শঙ্করাচার্যের 'আত্মানাত্মবিবেক' শীর্ষক গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশও তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাংলা ছাড়া দেশী বিদেশী অন্যান্য ভাষাতেও এই বিষয়ে তাঁর উদ্যম উল্লেখযোগ্য। 'বেদান্তগ্রন্থ' এবং 'বেদান্তসারের' হিন্দী অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কেন ঈশ মুণ্ডক এবং কঠ উপনিষৎ চতুষ্টয় এবং বেদান্তসার তিনি ইংরেজিতেও অনুবাদ করেন। বেদান্ত-সম্পর্কীয় তাঁর গ্রন্থ জার্মান এবং ডাচ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তিনি যে স্বদেশে তাঁর সমকালীন ধর্মজগতে মুখ্যতঃ বৈদান্তিক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক রূপেই সুপরিচিত ছিলেন তা তাঁর মৃত্যুসংবাদ এ দেশে প্রচারিত হওয়ার পরে, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ (১৯শে ফাল্গুন ১২৪০ বঙ্গাব্দ) তারিখের সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত শোকসূচক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত দুটি পঙ্‌ক্তি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—[১৫]

'বেদান্ত শাস্ত্রের অন্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার॥'

রামমোহনের শাস্ত্রবিচারমূলক গ্রন্থসমূহের যেগুলি এখনও প্রচলিত আছে, তা পাঠ করলে দেখা যাবে কি গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিনি বেদান্তদর্শনের আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী ধর্মাচার্যগণ (যথা শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ) বিভিন্ন সময়ে স্ব স্ব ধর্মমতের অনুকূলে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করেছিলেন। এই বিষয়ে আধুনিক যুগের ধর্মাচার্য রামমোহন পূর্বসূরিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের অনুগামী। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসাবে তিনি কোন্‌ মার্গ অবলম্বন করেছিলেন সে প্রশ্নের উত্তরও রামমোহনের গ্রন্থগুলি আলোচনা করলে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
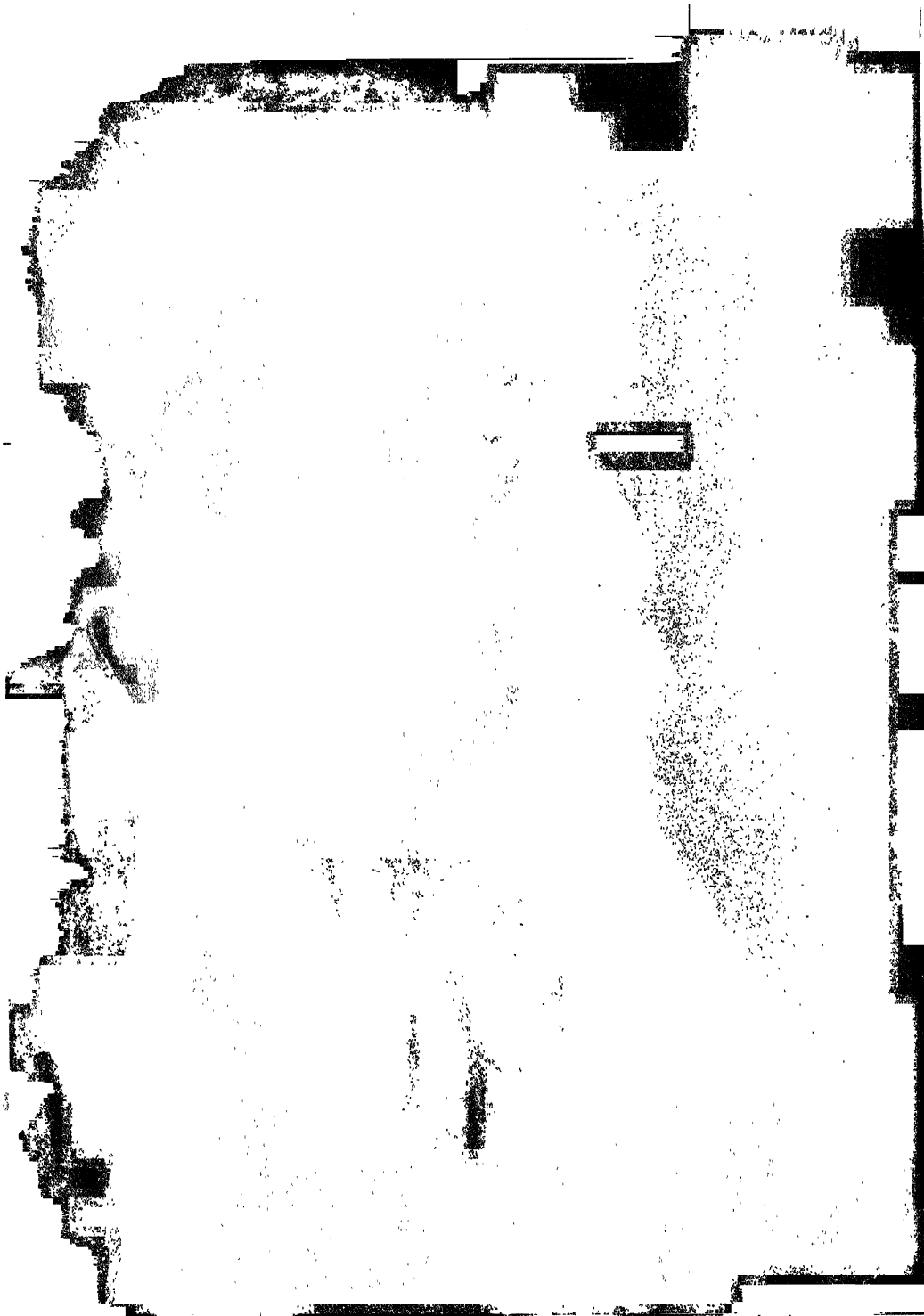
বৈদান্তিক পূর্বাচার্যগণের মধ্যে শঙ্করের উপরেই রামমোহনের সর্বাধিক শ্রদ্ধা ছিল। বেদান্তগ্রন্থের আরম্ভে শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:[১৬] "ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন, এ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদক ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।" তিনি বাংলা ভাষায় যে কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন, সেক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ শঙ্করাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন, কেন ঈশ কঠ এবং মাণ্ডুক্য উপনিষৎ গ্রন্থগুলিতেও এ বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।[১৭] বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ তাঁকে শঙ্করপন্থী বলে বিদ্রূপ করলে, উত্তরে তিনি বলেছিলেন: [১৭ক] "আর আমাদের প্রতি আচার্য (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য) মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।" কিন্তু রামমোহনের স্বরচিত বেদান্তভাষ্য ভালো করে পড়লে দেখা যায়, তিনি অনেক বিষয়ে শঙ্করকে অনুসরণ করলেও, শেষোক্ত আচার্যের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, স্বরূপলক্ষণের বিচার এবং কর্মকাণ্ডের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে শঙ্কর ও রামমোহন একমত। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ এবং মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। রামমোহন বেদান্তভাষ্যকাররূপে সম্পূর্ণ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে: প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মোপাসনার উপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি স্পষ্টই উপদেশ দিয়েছেন, গৃহী বা সংসারী ব্যক্তিও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।[১৮] শঙ্কর-দর্শনেও সাধনার অঙ্গরূপে 'উপাসনা' স্বীকৃত; কিন্তু উপাসনা অপেক্ষা সেখানে বোধ বা জ্ঞানকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়েছে। জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা দূর হলে তবেই সাধক তাঁর চরম লক্ষ্যস্থল মোক্ষের ভূমিতে উপনীত হতে পারেন, এই হল শঙ্করের সিদ্ধান্ত। উপাসনা এই উচ্চতম অবস্থা মানুষকে দিতে অক্ষম, কেননা উপাস্য-উপাসকের পরস্পর-সম্বন্ধ ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত (শঙ্করের ভাষায় "তত্রোপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব")।[১৯] কিন্তু রামমোহন শঙ্করের মত অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুক্তিকে ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই এ কথা বলেছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই এই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের অন্তর্ভুক্ত "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "মোক্ষ পর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যে হেতু বেদে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি।[২০] 'গায়ত্রীর অর্থ' (প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'প্রার্থনাপত্র' (প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্' (প্রকাশকাল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'ব্রহ্মোপাসনা' (প্রকাশকাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'অনুষ্ঠান' (প্রকাশকাল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বিতরণার্থ মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র পত্রী' নামক বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর পুস্তিকাগুলিতে রামমোহন 'উপাসনা' সম্পর্কে তাঁর মতামত অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন। উপাসনার প্রণালী সম্পর্কেও কঠোর শঙ্করপন্থিগণের সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তগণের মতে উপাসনা চিত্তকে শুদ্ধ ও কলুষমুক্ত করবার নিমিত্ত চিত্তের একাগ্রতাসাধন।[২১] উচ্চতর সাধনার প্রস্তুতিরূপেই মুখ্যতঃ এর প্রয়োজন। তাঁর 'অনুষ্ঠান' নামক পুস্তিকাটিতে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপাসনাপ্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে রামমোহন "কাহাকে উপাসনা কহেন" শিষ্যের এই প্রশ্নের আচার্যের

মুখে উত্তর দিয়েছেন, "তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।"[২২] যদিও তিনি "পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন"কে উপাসনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ মনে করতেন, তথাপি উপাস্যের ঐশ্বর্য বর্ণনাও তাঁর উপাসনা প্রণালীর অংশবিশেষ ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "এবং অগ্নি বায়ু সূর্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, ব্রীহি যব ঔষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থের দার্ঢ্য করিবেন।"[২৩] 'ব্রহ্মোপাসনা' শীর্ষক পুস্তিকাতে তিনি "নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়", বিতরণার্থ মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র পত্রী'তে "বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণম্", এবং "শাশ্বতমভয়মশোকমদেহম্", প্রভৃতি যে স্তবগুলি সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেগুলিকে আমরা শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ মনে করতে পারি।[২৪] তাঁর স্বকীয় উপাসনাপ্রণালীর এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, রামমোহন পরবর্তিকালে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে গৃহীত উপাস্যের স্বরূপ-আরাধনার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রসঙ্গে তিনি "আরাধনা" শব্দটিও ব্যবহার করেছেন ("...তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন")।[২৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কঠোর শঙ্করপন্থীদের ন্যায় উপাসনাকে সম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক মনে না করে, রামমোহন তাকে জ্ঞানাশ্রিত ভক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্করের সঙ্গে রামমোহনের দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারসমস্যা নিয়ে। শঙ্করের মতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু রামমোহন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, সংসারী গৃহস্থেরও পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার আছে:[২৬] "যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে· ·কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।"

উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল, শঙ্করের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তত্ত্বসিদ্ধান্তে নির্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী হলেও, বৈদান্তিক হিসাবে রামমোহনের কতগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। উপাসনার প্রাধান্য স্বীকৃতি এবং বিশিষ্ট উপাসনাপ্রণালীর উদ্ভাবনের দ্বারা তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠতে পারে, কোন্ প্রভাবের ফলে তাঁর এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর গঠন সম্ভব হয়েছিল। এ দেশের শঙ্করোত্তর কালের বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে এমন সমন্বয়ের আভাস দেখা না গিয়েছে তা নয়। শ্রীধর (খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক?) বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তাঁর সুবিখ্যাত টীকাত্রয়ে শঙ্করের সমস্ত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ভক্তিই অদ্বৈতমুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বয়ং চৈতন্যদেবের গুরুপরম্পরার মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং কেশব ভারতীও এই প্রকার ভক্তিবাদী শঙ্করপন্থী ছিলেন এমন কথা মনে করবার কারণ আছে।[২৭] এ ছাড়া চতুর্দশ শতকে বিদ্যারণ্য ষোড়শ শতকে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতিগণও শঙ্করমতের মধ্যে উপাসনা ও ভক্তিকে যথেষ্ট

প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য যেন রামমোহনের মতের প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন: "উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব জ্ঞানব্যতিরেকে মুক্তির আর উপায়ান্তর নেই, শাস্ত্রের এই উক্তির সঙ্গে উপাসনার কোনও বিরোধ নেই।"[২৮] উপরি-উক্ত বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে রামমোহন শ্রীধরস্বামীর রচনাবলীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন যে স্বয়ং চৈতন্যদেব কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত শ্রীধর, চৈতন্যগুরু কেশব ভারতী প্রভৃতি ভক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করের অনুবর্তী ছিলেন। তর্কপ্রসঙ্গে তাঁর বৈষ্ণব-প্রতিপক্ষকে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন:[২৯] "যদ্যপিও ভগবান্ আচার্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগ্যের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন, আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্বথা মান্য, এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন, আর সেই শ্রীধর স্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃর্গিরস্তথা, ইত্যাদি।· ·এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে, সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্বাপর্যানুসারত ইত্যাদি। অতএব ভগবান আচার্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক এবং আচার্যমতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে, অতএব আচার্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগ্যের ধর্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়।" কিন্তু নিজধর্মমতের বিবর্তনে বৈষ্ণব চিন্তাধারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। সাম্প্রদায়িক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত কোনও আকারেই তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, কেননা তার মধ্যে সাকারোপাসনার প্রাধান্য অত্যধিক, এবং চৈতন্যদেবের অবতারত্ব স্বীকৃত। রামমোহন সাকারোপাসনা ও অবতারবাদ, দুইএরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। অপরপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঈশ্বরের রূপকল্পনা বা লীলাবর্ণনার কোনও রূপক ব্যাখ্যা করাও সম্ভব ছিল না কেননা সে মত অনুযায়ী সব লীলাই নিত্য।[৩০] শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় দেখিয়েছেন শঙ্কর ভিন্ন অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে রামমোহন ভক্তিবাদী মধ্বের মতামত যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন।[৩১] কিন্তু মধ্বমত তিনি গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; কেননা তত্ত্বসিদ্ধান্তে মধ্ব ছিলেন বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদী। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচারের অন্তর্গত দ্বিতীয় প্রত্যুত্তরপ্রসঙ্গে রামমোহন অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মধ্বমতের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন।[৩২] রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্তও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, কেননা তিনি স্বয়ং ছিলেন নির্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী। তা ছাড়া রামানুজ সাকার বিষ্ণূপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তা রামমোহনের মনঃপূত হবার কথা নয়।[৩৩] অপরপক্ষে নিজরচনার মধ্যে বিদ্যারণ্য, মধুসূদন প্রভৃতি জ্ঞানভক্তির সমন্বয়-কারক অদ্বৈতিগণকে অনুসরণ করতেও তাঁকে দেখা যায় না। সুতরাং পূর্ণ অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকু কোন্ প্রভাবের ফলে সঞ্জাত, এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রামমোহনের শাস্ত্রালোচনামূলক গ্রন্থগুলি অনুশীলন করলে স্বভাবতঃ প্রতীতি জন্মায় তাঁর আলোচ্য মনোভাব গঠনে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র।

সাধারণ অর্থে তন্ত্র বলতে যে কোনও শাস্ত্রকে বোঝালেও এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। "উপাসনাবিশেষ প্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ" অর্থে শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি।[৩৪] তন্ত্র ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বিশিষ্ট বিকাশ। এর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে, যে সবের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণ ভাবে এই চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলা যেতে পারে। পণ্ডিতগণের মতে তন্ত্রের অনেকটাই মূলতঃ এসেছে অবৈদিক অনার্য চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠানের থেকে। এর আলোচ্য বিষয়কে প্রধানতঃ দুই ভাগ করা যায়: (১) দর্শন (২) ক্রিয়া। পরবর্তী যুগে অবশ্য এই ভাবধারা আর্য সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করে ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দুধর্মের বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীপূজা বা অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্রের দ্বারা অতি গভীর ভাবে প্রভাবিত।[৩৫] উপাস্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, যথা শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য স্বায়ম্ভুব কালমুখ প্রভৃতি। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত শৈবশাক্ত মতবাদের মধ্যে আবার দিব্য বীর পশু বাম চীন দক্ষিণ সময়, কুল প্রভৃতি বিভিন্ন আচার বা উপাসনাপদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৬] তান্ত্রিক পূজা ও সাধনপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি অর্থহীন ও নীতিমার্গের পরিপন্থী আচার ও ক্রিয়ার সমষ্টি ব'লে সাধারণের কাছে প্রতীয়মান হলেও, এগুলিই তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের সব নয়। তন্ত্রের একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে উক্ত দর্শনের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তের কোনও সিদ্ধান্তগত প্রভেদ নেই। তন্ত্র বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেছে। এ সম্পর্কে কুলার্ণব তন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে তন্ত্রের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে:[৩৭]

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্যোদয়ো যথা॥

তন্ত্রদর্শনের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দর্শন সম্পর্কে বলেছেন:[৩৮] "The monistic philosophy of the Vedanta forms its backbone and we see that *Brahman* is regarded as the only true Principle in the world." কিন্তু কেবলমাত্র তন্ত্রধর্মের তত্ত্বসিদ্ধান্তই নয়, তন্ত্রের পূজাপদ্ধতি পর্যন্ত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। এ সম্পর্কে অপর একজন তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের মতামত কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:[৩৯] "The Tantra form of worship also serves as a course of practical training for the realization of the Vedanta ideal of the identity of the finite with the Infinite, of the individual soul with the Supreme Soul. The various parts of this worship—*Bhutasuddhi* and the different Nyasas—all aim at this realization. The worshipper has to conceive his body as the seat of the deity at the time of offering worship. On the occasion of 'internal worship' (antaryaga) which is the ideal and more preferable from of worship, this process is carried a step further. Here the worshipper has to make attempts to realize the identity of the deity not only with himself but also with all the objects of

worship. It would thus appear that in spite of the differences in doctrinal details the Tantras had the same ideal in view as the Vedanta." তত্ত্বগতভাবে বেদান্ত এবং তন্ত্রের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হলেও, তন্ত্র যে ক্ষেত্রে নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছে তা হল উপাসনা। শাঙ্কর বেদান্তে উপাসনার স্থান যে খুব উচ্চে নয় এ আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। মুখ্যতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্যই সেখানে এর প্রয়োজন স্বীকৃত। কিন্তু তন্ত্রে ব্রহ্ম বৈষ্ণবধর্মের পরমেশ্বরের মতই উপাস্য এবং আরাধ্য এবং এই অর্থে ব্রহ্মোপাসনা তান্ত্রিক ধর্মসাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মহানির্বাণ তন্ত্রে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে :[৪০]

ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে।

"মুক্তিলাভের নিমিত সেই ব্রহ্ম বিনা ধ্যেয়, পূজ্য এবং সুখারাধ্য অন্য কেউ নেই।" এই ব্রহ্মোপাসনাকে আশ্রয় করেই ভক্তি তন্ত্রসাধনায় অতি উচ্চ আসন লাভ করেছে। কুলার্ণবে বলা হয়েছে :[৪১]

ভজনাৎ পরয়া ভক্ত্যা মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
তরত্যখিলদুঃখানি তস্মাদ্ভক্ত ইতীরিতঃ॥

সুতরাং অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সাধক তাঁর সাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞান-ভক্তির যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছেন কঠোর শঙ্করপন্থী অদ্বৈতিগণের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। (অবশ্য শঙ্করোত্তর কালে অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ের প্রয়াস হয়েছিল; সে কথার উল্লেখ পূর্বে করেছি। সে প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না।)

সাধনপ্রণালীর ক্ষেত্রেও বেদান্ত এবং তন্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। বেদান্ত সংসারকে, পার্থিব জীবনের সুখদুঃখকে অসার জ্ঞান করে, সংসারবিমুখ হয়ে মোক্ষসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে সাধককে উপদেশ দেয়। কিন্তু তন্ত্রোক্ত পঞ্চ 'ম'কার সাধন, ষট্‌কর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তন্ত্রশাস্ত্র এই সংসারকে এবং মানুষের ব্যাবহারিক জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে। মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভোগবাসনানিচয়কে মোক্ষের পথে চরম বিঘ্ন জ্ঞান করে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে, উক্ত প্রবৃত্তিসমূহকে আশ্রয়পূর্বক সেগুলির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করা তন্ত্রসাধনার প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য বেদান্তের জীবনবিমুখতায় স্থলে তন্ত্রে আমরা দেখি এক বলিষ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি, যদিচ উভয়ের মূল উদ্দেশ্য এক। জনৈক সনাতনপন্থী তান্ত্রিক পণ্ডিত বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিদ্বয়ের এই পার্থক্য সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন :[৪২] "···বৈদিক সাধকের ন্যায় তান্ত্রিক সাধককে সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ স্ত্রী পুত্র, মিত্র ভৃত্য পরিজনময় সংসারের যে ঘৃণিত বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ-তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণপ্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান-পরম্পরা বলিয়া ···দেখাইয়া দিতেছেন···তান্ত্রিক সাধক···পঙ্কে ডুবিয়াও পঙ্কবিহারী মৎস্যের ন্যায় নিত্যনির্লিপ্ত।"

সামাজিক ক্ষেত্রেও তন্ত্রমত বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা বহুগুণে উদার ও প্রগতিশীল। প্রাচীন যুগে যেমনই হোক পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির সামাজিক দৃষ্টি ছিল অনুদার ও সংকীর্ণ। নারী ও শূদ্রের বেদাধ্যয়ন এমনকি বেদ-শ্রবণের উপরেও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে, এমন বিধান স্বীকার করে নিতেও ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ এতটুকু দ্বিধা করে নি। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রই বোধ

করি সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম বিধিনিষেধের বেড়ি ভাঙবার জন্য এগিয়ে আসে আচণ্ডাল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মন্ত্রদীক্ষার অধিকার প্রসারিত করে। গৌতমীয় তন্ত্রের আরম্ভেই দেখা যায় ঋষি গৌতম বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেছেন— "যে মন্ত্র সর্বপ্রকার ফলদাতা অথচ সকলের বন্ধু, এবং যে মন্ত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকার এবং যে মন্ত্র নারীদেরও যোগ্য, ভগবন্‌,সর্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্র আমাকে বলুন"।[৪৩] মহানির্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টতঃ চণ্ডাল এবং যবনদের পর্যন্ত সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।[৪৪] ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর সমদৃষ্টি তন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হবার দুটি সম্ভাব্য সূত্র ছিল। প্রথমতঃ তাঁর মাতৃবংশ ছিলেন শাক্ত তান্ত্রিক এবং শৈশবে রামমোহন তাঁর মাতামহ ঘোর তান্ত্রিক শ্যাম ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অবশ্য এই সংযোগ শিশু রামমোহনের মনের গঠনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা সঠিক জানবার উপায় নেই, তবে তান্ত্রিক মহলে পরবর্তীকালে এই যোগাযোগের উপর খানিকটা গুরুত্ব যে আরোপ করা হত, তা এই সম্পর্কে প্রচলিত দুএকটি কিংবদন্তী থেকেই বুঝতে পারা যায়।[৪৫] মাতামহের এবং মাতৃবংশের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত যেমনই হোক, এ কথা সুনিশ্চিত যে রামমোহন তন্ত্রমতের দ্বারা গভীর রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন সুবিখ্যাত কৌল তান্ত্রিক সাধক ও সন্ন্যাসী হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের সঙ্গে তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গতার ফলে। রামমোহনের চোদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর সঙ্গে হরিহরানন্দের প্রথম পরিচয় হয়, এবং তা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে আজীবন স্থায়ী হয়। ইনি রংপুরে, এবং পরে রামমোহন কলিকাতার স্থায়ী অধিবাসী হলে, কলিকাতায়, রামমোহনের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে ইনি সুবিখ্যাত কুলার্ণব তন্ত্র প্রকাশ করেন এবং মহানির্বাণ তন্ত্রের সম্বন্ধে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। রামমোহন এঁর কাছে তন্ত্রশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন।[৪৬] কেউ কেউ বলেছেন হরিহরানন্দ রামমোহনের গুরু ও ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় শীর্ষক বৈষয়িক মামলায় রামমোহনের পক্ষ হয়ে সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে হরিহরানন্দ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করলেও রামমোহনকে তাঁর শিষ্য বলে অভিহিত করেন নি। কিন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কথা বলেছেন।[৪৭] অবশ্য প্রচলিত অর্থে হরিহরানন্দ, রামমোহনের গুরু হয়ে থাকুন বা না হয়ে থাকুন, রামমোহন যে তাঁকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কলিকাতায় বাসকালে হরিহরানন্দ রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতেই থাকতেন এবং রামমোহন- প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার অধিবেশনে যোগ দিতেন। রামমোহনের চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর উপর তাই হরিহরানন্দের সান্নিধ্যহেতু তন্ত্রমতের প্রভাব বিস্তীর্ণ হবার একটি বিশেষ সুযোগ ছিল।

রামমোহনের বিচারগ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করলে তাঁর তন্ত্রশাস্ত্রালোচনার একটি সমগ্র রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। দেখা যাবে এগুলির মধ্যে তিনি সর্বসমেত উনিশখানি তন্ত্র বা তন্ত্রজাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং সেসবের অধিকাংশ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যথা, (১) কুলার্ণব তন্ত্র (৩৪ বার)[৪৮]; (২) মহানির্বাণ তন্ত্র (২২ বার)[৪৯]; (৩) তন্ত্রসার (৪ বার)[৫০]; (৪) নির্বাণতন্ত্র (৭ বার)[৫১]; (৫) কুলাবলী (কৌলাবলী) তন্ত্র (২ বার)[৫২]; (৬) কুলার্চনচন্দ্রিকা (২ বার)[৫৩]; (৭) কুলতন্ত্র (৩ বার)[৫৪]; (৮) কুলার্চনদীপিকা (৬ বার)[৫৫]; (৯) কুব্জিকা তন্ত্র (১ বার)[৫৬]; (১০) সময়াতন্ত্র (২ বার)[৫৭]; (১১) কামাখ্যা তন্ত্র (২ বার)[৫৮]; (১২) নিরুত্তর

তন্ত্র (১ বার)[৫৯]; (১৩) কালীবিলাস তন্ত্র (১ বার)[৬০]; (১৪) কালীকল্পলতা (২ বার)[৬১]; (১৫) অনন্তসংহিতা (২ বার)[৬২]; (১৬) তন্ত্ররত্নাকর (২ বার)[৬৩]; (১৭) কালিকোপনিষৎ (২ বার)[৬৪]; (১৮) দেবীমাহাত্ম্য (৩ বার)[৬৫]; (১৯) সিদ্ধলহরী তন্ত্র (২ বার)[৬৬]। এই সম্পূর্ণ গাণিতিক হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রামমোহন বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত শৈবশাক্ত মতের অন্তর্গত কৌল তান্ত্রিক সাহিত্যই বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর মাতৃকুল ছিলেন শাক্ত; এবং তাঁর তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী স্বয়ং ছিলেন বামাচারী কৌল সন্ন্যাসী। এই দুটি কথা মনে রাখলে কৌল সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই প্রবণতা অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দিব্যাচার পশ্বাচার বামাচার সময়াচার দক্ষিণাচার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির যে তিনি খবর রাখতেন, তা তাঁর সময়াতন্ত্রের এবং রচনাবলীর বিভিন্নস্থানে উপরি উক্ত অন্যান্য বিধিগুলির উল্লেখ থেকেই প্রমাণিত হয়।[৬৭] তন্ত্রমত যে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত এ সম্পর্কেও রামমোহন সচেতন ছিলেন, কেননা 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন[৬৮]: "তন্ত্রমতবিমুখ ব্যক্তি প্রায় এ দেশে অপ্রাপ্য।"

এর পরে স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠবে রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনি প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র মেনেছেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাদেশবাদ স্বীকারের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সার্বভৌম একেশ্বরবাদের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে তিনি দেশকালনিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রমাত্রেরই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক অংশকে প্রত্যাদিষ্ট বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচারে তাঁকে ব্রহ্মণ্যশ্রুতির, খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের সঙ্গে তর্কে বাইবেলের এবং মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে কোর্-আনের অভ্রান্ততা মূলতঃ স্বীকার করে নিতে দেখা যায়। এই দৃষ্টি থেকে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রকেও আপ্তশাস্ত্র মনে করতেন, তবে এ কথাও তিনি তাঁর রচনাতে স্পষ্ট বলেছেন, পুরাণ ও তন্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক অংশই প্রকৃত প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র, অন্যান্য অংশ সমূহে যেখানে সাকার দেবতার ও সাকার উপাসনাবিধির উল্লেখ আছে তা অশক্ত ও নিম্ন অধিকারিগণের জন্য রচিত।[৬৯] এই অর্থে রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও এগুলিকে তিনি শাস্ত্র হিসাবে বেদের ন্যায় উচ্চস্থান দেন নি। তাঁর ভাষায়[৭০]: "...হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন, বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়।" সুতরাং তন্ত্রপুরাণাদির অংশবিশেষ আপ্তশাস্ত্ররূপে শ্রদ্ধেয় হলেও রামমোহনের মতে বেদ-উপনিষদের স্থান তদপেক্ষা অনেক উচ্চে। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় শাস্ত্রের প্রত্যাদিষ্টত্ব সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর স্পষ্টতঃ দুটি স্তর আছে।

তন্ত্রমত সুপ্রাচীন হলেও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থগুলি প্রায় কোনোটিই খুব প্রাচীন নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও যে অনেক তন্ত্রগ্রন্থ যে রচিত হয়েছে তা সেগুলির ভাষা বা বিষয়বস্তুর বিচার করলে ধরা পড়ে। এই জন্য তন্ত্রসম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গের একটি দুরূহ সমস্যা হল, আলোচ্য তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য নির্ণয়। রামমোহনকেও শাস্ত্রবিচার-প্রসঙ্গে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আলোচ্য কোনও তন্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি যে দুটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন তা এই : (১) গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টীকা থাকবে; (২) দ্বিতীয় লক্ষণ, তার বচন নিবন্ধাদি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত থাকবে ("...তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই...এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদি টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য· ·অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা আছে...অতএব সটীক কিংবা

মহাজনধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন")।[৭১] আশ্চর্যের বিষয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে শাস্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য নির্ণয়ের যে দুটি উপায় আধুনিক পণ্ডিত ও গবেষকগণ অবলম্বন করে থাকেন, সনাতন পদ্ধতিতে শাস্ত্রশিক্ষা করেও অপূর্ব মনীষাবলে রামমোহন এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে তা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিচারে রামমোহনের প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে 'অনন্তসংহিতা' নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করলে, রামমোহন উপরি-উক্ত আদর্শের মাপকাঠিতে 'অনন্তসংহিতা'কে প্রামাণ্যহীন অর্বাচীন গ্রন্থ ঘোষণা করেন এবং এই উপলক্ষে কতকটা কৌতুকের বশবর্তী হয়েই দেখান যে ঠিক অনুরূপ একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ তন্ত্ররত্নাকরের ভিত্তিতে চৈতন্যসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করাও চলে, কিন্তু সেরূপ দুর্বল প্রমাণ ব্যবহার করা পণ্ডিতজনোচিত নয় ("এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে এ নিমিত্ত আমাদের এবং তাবৎ পণ্ডিতদের নিয়মানুসারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসনা ছিলনা···")।[৭২]

নিজ শাস্ত্রালোচনায় ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রামাণ্যবিচারে উক্ত কঠোর মানদণ্ড যদিও রামমোহন প্রয়োগ করেছিলেন, তথাপি আপাতদৃষ্টিতে এর একটি ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয়। তা হল মহানির্বাণ তন্ত্র। বর্তমান আকারে এই বহুলপ্রচলিত গ্রন্থটিকে খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না, এর খুব পুরাতন পুঁথিও পাওয়া যায় নি। কোনও প্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থে এর থেকে কোনও উদ্ধৃতি আছে, এমন কথাও আমাদের জানা নেই। তথাপি রামমোহন অতি যত্নসহকারে এবং পরম শ্রদ্ধা নিয়ে গ্রন্থখানি যে পাঠ করেছিলেন এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর্থার অ্যাভেলন (স্বর্গীয় স্যার্ জন উড্রফ্) তৎসম্পাদিত মহানির্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন[৭৩] : "The Tantra has been subject of commentary by Hariharananda. The manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the commentary the Raja writes "Om namo Brahmane" and in the beginning of the commentary to the 9th chapter there is in addition to the above, the following invocation 'Shri-shri natha-padambhoje niyatam matirastu me.' মহানির্বাণ তন্ত্রকে রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন, এবং কেউ কেউ এ রকম ইঙ্গিতও করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত এই মূল গ্রন্থখানিই হরিহরানন্দের রচিত অথবা তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত। শেষোক্ত মত সত্য কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে বলবার উপায় নেই, কিন্তু গ্রন্থখানি যে প্রাচীন নয় এ কথা সম্ভবতঃ ঠিক। হয়তো বা হরিহরানন্দ এবং তাঁর রচিত টীকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ রামমোহন এই গ্রন্থখানির প্রামাণ্যনির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর প্রখর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে এইটুকু মনে রাখা যেতে পারে, রামমোহনের প্রতিপক্ষীয় কোনও পণ্ডিত সেযুগে মহানির্বাণ তন্ত্রের বিরুদ্ধে আধুনিকত্বের অভিযোগ আনেন নি। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অভিযোগ করেছিলেন রামমোহন মাত্র কুলার্ণব ও মহানির্বাণের বচনের উপর নির্ভর করেছেন এবং এ দুটির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, কেননা তা শ্রুতিস্মৃতি ও অপর তন্ত্রাদির বক্তব্যের বিরোধী।[৭৪] এর উত্তরে রামমোহন নানা প্রমাণ উপস্থিত করে দেখান যে কুলার্ণব ও মহানির্বাণ

এই কৌল আগমদ্বয়ের শিক্ষা শ্রুতিবিরোধী নয়, সুতরাং এ দুটি সদাগম।[৭৫] তাঁর পক্ষে আরও বলবার ছিল যে তিনি এ দুটি ছাড়া অন্য তন্ত্রগ্রন্থের বচনও যথেষ্ট উদ্ধৃত করেছেন। যাই হোক এই তর্ক মহানির্বাণ তন্ত্রের আধুনিকতার প্রশ্নসংক্রান্ত নয়।

তন্ত্রের প্রভাব রামমোহনের জীবনে পড়েছিল, দুটি ক্ষেত্রে— তাঁর চিন্তায় এবং তাঁর কর্মে। অন্যান্য শাস্ত্রের মত তন্ত্রের ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকেই রামমোহন প্রত্যাদিষ্ট বলে মান্য করতেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতীকোপাসনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তান্ত্রিক মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের যে বিপুল অংশ বিদ্যমান, সেই সাম্প্রদায়িক ও সাকার তন্ত্রোপাসনাকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তন্ত্রোক্ত মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি তথাকথিত কার্যে সিদ্ধিপ্রদ ষট্‌কর্মকে ও তিনি শ্রদ্ধা বা সেসবে বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না।[৭৬] তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রথমতঃ এই কারণে যে তার মধ্যে তিনি তাঁর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। খুব দৃঢ়ভাবেই এ কথা তিনি একাধিক স্থানে বলেছেন, যেমন[৭৭]: "শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণমননাদের্নিঃশ্রেয়সাবাপ্তি-রৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ॥ আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছ্রোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তম্‌…।" কিন্তু এ ছাড়া তন্ত্র থেকে বিশেষ ভাবে তিনি যে তত্ত্ব লাভ করেছিলেন, তা হল ব্রহ্মোপাসনা। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভক্তিভাবের মিশ্রণ বৈদান্তিকরূপে রামমোহনের বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রের উপাসনাতত্ত্বের প্রভাবেই রামমোহনের চিন্তাধারা এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল। তাঁর ভক্তিতত্ত্ব রামমোহন আহরণ করেছিলেন, বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে নয়, তন্ত্রশাস্ত্র থেকে। ব্রহ্মোপাসনা শীর্ষক পুস্তিকাতে তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে যে ব্রহ্মস্তোত্রটি তাঁর উপাসনা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।[৭৮] তাছাড়া গায়ত্রীর অর্থ নামক পুস্তিকাতে ব্রহ্মোপাসনাপ্রসঙ্গে তিনি বার বার তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন।[৭৯] তাঁর উপাসনাপদ্ধতিতে রামমোহন বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন এবং একাধিক স্থলে তিনি এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে এর দ্বারা ব্যক্তিগত উপাসনা নির্বাহ করবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন[৮০]। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রীর স্থান অতিশয় উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ। শ্রুতিসম্মত হিন্দুধর্মীয় পুজাদিতে যেমন উত্তরকালে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়, তেমনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মেও কিছু কিছু বেদমন্ত্রাদি ক্রমশ প্রবেশলাভ করে[৮১]। এই জাতীয় বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী তন্ত্রশাস্ত্রে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তন্ত্রোক্ত বহু দেবতার নামের সঙ্গে এই মন্ত্র যুক্ত হয়ে, তা নানা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর তন্ত্রসার গ্রন্থে এই প্রকার বিভিন্ন দেবতার নাম-সংযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন[৮২]। গায়ত্রী মন্ত্রের মাহাত্ম্যসূচক 'গায়ত্রী তন্ত্র' শীর্ষক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, মহানির্বাণ তন্ত্রে গায়ত্রীকে ব্রহ্মমন্ত্র বলা হয়েছে এবং এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করবার বিধান দেওয়া হয়েছে এবং রামমোহন তাঁর "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানম্‌" গ্রন্থে নানা শ্রুতিস্মৃতি আলোচনার পর মহানির্বাণতন্ত্রের মত বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন[৮৩]। এ কথা না মেনে উপায় নেই, তন্ত্রশাস্ত্রালোচনার ফলে এই বেদমন্ত্রটির প্রতি রামমোহনের আস্থা ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই, যে বিশিষ্ট

ব্রহ্মোপাসনা-তত্ত্ব তিনি তন্ত্রের ভাবধারা অনুশীলনের ফলে লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে গায়ত্রীকে তিনি এত উচ্চ আসন দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হওয়া সত্ত্বেও যে সন্ন্যাসবিরোধী মনোভাব রামমোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাও অনেকাংশে তান্ত্রিক প্রভাবের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সংসারকে তার সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা বাধা প্রলোভন সমেত সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যে তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য তা আমরা পূর্বে দেখেছি। কুলার্ণব তন্ত্রে এই আদর্শটিকে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করা হয়েছে[৮৪] :

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসার : কুলধর্মে কুলেশ্বরি ॥

.. .. ..

মৃত্যুর্বৈদ্যায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্।
স্বর্গঃ সাক্ষাদ্ গৃহায়তে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥

মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ সকল বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে গার্হস্থ্যধর্মকে "সকল মানবের আদি এবং ধর্মজনক" বলে অভিহিত করা হয়েছে[৮৫]। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই ছিল রামমোহনের আদর্শ। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকায় অবশ্য তন্ত্রগ্রন্থ থেকে কোনও উদ্ধৃতি নেই, প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্য ও মনুস্মৃতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা সাধারণভাবে ধরে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে, যে রামমোহন তার বলিষ্ঠ জীবন-স্বীকৃতির অনুপ্রেরণা অনেকপরিমাণে তন্ত্রদর্শন থেকে পেয়েছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূল সূত্র এখানেই খুঁজতে হবে।

ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরোপাসনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বজনীন উদারদৃষ্টির জন্যও যে কতকাংশে রামমোহন তান্ত্রিক ভাবধারার নিকট ঋণী, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। দেশজাতিধর্ম নির্বিশেষে ব্রহ্মোপাসকগণের জন্য একটি সার্বজনীন উপাসনালয় স্থাপন করা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শেরই রূপায়ন। ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীডে এই আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সমাজগৃহ "to be used occupied enjoyed, applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of peoples without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober, religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being· ·" আমরা পূর্বে দেখেছি, রামমোহন-কর্তৃক আলোচিত শাস্ত্রাদির মধ্যে এক তন্ত্রেই ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকল বর্ণ, নারী এমন কি যবন পর্যন্ত সকলেরই পূর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক ও বৈদান্তিক ঐতিহ্যে এ জাতীয় সমদৃষ্টির একান্ত অভাব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তাধারার উপর তন্ত্রমতের প্রভাব সম্পর্কে আমরা সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহ হতে পারি। এই প্রসঙ্গে রামমোহন ও তাঁর উপাসকমণ্ডলীর প্রতি প্রযুক্ত 'ব্রাহ্মসমাজ' নামের অন্তর্গত "ব্রাহ্ম" বিশেষণটির উৎপত্তি সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে "ব্রাহ্ম" শব্দটি অপর কোনও

ধর্মমণ্ডলী সম্পর্কে কখনও এ দেশে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। মহানির্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে তত্ত্বচক্রের বর্ণনা কালে ঐ চক্রের অধিকারিগণের প্রসঙ্গে কিন্তু শব্দটিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়[৮৬] :

পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ॥
নির্বিকারা নির্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসকংল্পকা ব্রাহ্ম্যাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥

এই "ব্রাহ্ম" বা "ব্রাহ্ম্য" শব্দটি যে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তত দশ বৎসর পূর্ব হতে রামমোহনের মণ্ডলীসম্পর্কে প্রযুক্ত হত তার প্রমাণ আছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের ক্যালকাটা জার্নালে রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দের সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধ সমালোচনাপূর্ণ একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে তিনি রামমোহনের মণ্ডলীকে "Brahmyu or Unitarian Hindu community" বলে উল্লেখ করেছেন[৮৭]। আরও দুই বৎসর পূর্বে, ১৮১৭ সালে, ব্রহ্মোপাসক অর্থে রামমোহন স্বয়ং শব্দটি ব্যবহার করেছেন মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায়। অন্যত্রও রামমোহন এবং রামমোহনের প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনপন্থী ব্রহ্মোপাসকগণকে ঐ নামে অভিহিত করেছেন[৮৮]। স্বয়ং হরিহরানন্দ এবং রামমোহনের উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, মহানির্বাণবর্ণিত তত্ত্বচক্রের অধিকারিগণের নামবিশেষের অনুকরণে, রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত উপাসকমণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই "ব্রাহ্ম" বা "ব্রাহ্ম্য" নামে সুপরিচিত ছিলেন। "ব্রাহ্মসমাজ" সেই অভিধারই স্মৃতি বহন করছে। এ কথাও বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নারীজাতিকে পুরুষের সমতুল্য আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার মত উদারতা রামমোহন বহুলাংশে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। রামমোহনের পৌত্রী (রাধাপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) চন্দ্রজ্যোতি দেবী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে এ বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা এই: "রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রী জপ। তাঁর ছোট পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের পত্নী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকগুলি আওড়াতে ইদানীং আমরা নিজের কানে শুনেছি। গায়ত্রী জপও করতেন দ্রবময়ী দেবী রীতিমত। যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে; ধর্মসংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম।"[৮৯]

তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তিগত মতামত ও আচরণেও রামমোহন যে তন্ত্রের মত ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে প্রমাণও উদ্ধার করা যায়। মহানির্বাণ তন্ত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সতীদাহ-প্রথা নিষেধ করা হয়েছে (ভর্ত্রাসহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্)[৯০]। সতীদাহ-আন্দোলনের পুরোধা রামমোহনকে যে এই জাতীয় শাস্ত্রবচন যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে থাকবে, এ অনুমান আমরা অবশ্যই করতে পারি। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন রামমোহন করেছেন অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় সহমরণ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে[৯১]। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি মহানির্বাণ তন্ত্রের উক্তি "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ[৯২]।" তাঁর দুখানি বিচারগ্রন্থে রামমোহন মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের আদর্শকে সমর্থন করেছেন। এই বিবাহে জাতিবর্ণধর্মগত কোনও বাধা নেই, কেবলমাত্র পাত্রী সপিণ্ডা বা সধবা

না হলেই যথেষ্ট[৯৩]। সর্বশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, মাংসাহার ও পরিমিত সুরাপান সম্পর্কে রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশকেই প্রামাণিক মনে করতেন এবং এর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন[৯৪]।

রামমোহন চিন্তায় ও কর্মে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রমত কর্তৃক বিশেষ রূপে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল। কিন্তু একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য, তার নিজস্ব সাধনপদ্ধতি। রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কি তান্ত্রিক সাধনাও করেছিলেন? দুঃখের বিষয় এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে নেই। রামমোহনের একটি গভীর সাধকজীবন ছিল, এ ইঙ্গিত তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেকে দিয়েছেন, কিন্তু এই সাধনার প্রকৃতি ও পদ্ধতি যে কি, তা জানবার উপায় নেই। রামমোহনের জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন, রামমোহন তরুণ বয়সে (একেশ্বরবাদী হবার পূর্বে) একবার বহু অর্থব্যয় করে বাইশবার পুরশ্চরণ করেছিলেন।[৯৫] এই পুরশ্চরণ তান্ত্রিক উপাসনার একটি প্রসিদ্ধ অঙ্গ এবং তন্ত্রমতানুযায়ী এই ক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্রশক্তি বর্ধিত ও মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়।[৯৬] পরবর্তীকালে শাস্ত্রবিচারপ্রসঙ্গে রামমোহন কুলার্ণব তন্ত্রের মদ্যমাংস গ্রহণের সমর্থন-সূচক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "এ বচনের অধিকার তান্ত্রিকের প্রতি হয় অতএব এসকল বচনের বিষয় অধিকারিভেদ স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না।"[৯৭] কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এখানে রামমোহন তান্ত্রিক সাধকের উচ্চাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করছেন, যদিও উল্লেখটি অস্পষ্ট এবং তার নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে কৌল তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মর্মে একটি ঐতিহ্য আছে যে রামমোহন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এর দুএকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাচ্ছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার অন্তর্গত মদন কামার নামক এক তান্ত্রিকের উল্লেখ করেছেন, "তাঁহার গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিমূর্তি লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমূর্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। মদনের প্রতিবাসী প্রবন্ধ-লেখকের জনৈক বন্ধু, তাঁহাকে এইরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।"[৯৮] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে দিল্লী-ভ্রমণকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন:[৯৯] "এখানে সুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য।⋯সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে আমি এবং রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মত তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।" ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা ভ্রমণ কালে দেবেন্দ্রনাথ সেখানকার সন্ন্যাসিগণের সত্রে এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনাপ্রসঙ্গে মহর্ষি জানতে পারেন তিনি শবসাধক তান্ত্রিক। মহর্ষি আরও লক্ষ্য করেন যে এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পুস্তকাদি সমস্তই রামমোহন রায়ের গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ।[১০০] এই সাক্ষ্যগুলি মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধক ও সিদ্ধপুরুষরূপে রামমোহন সুপরিচিত ছিলেন। এই প্রসিদ্ধির মূলে কোনও সত্য আছে কি না তা নিশ্চিত বলবার উপায় নেই।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী 'ব্রাহ্মসমাজে'র ধর্মমতে এই তান্ত্রিক ঐতিহ্য কতটা রক্ষিত হয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয়, প্রায় কিছুই হয় নি। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন কর্তৃক আহরিত এবং 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় সন্নিবেশিত মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্রটি, ("নমস্তে সতে

সর্বলোকাশ্রয়ায়) কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে, তাঁর "ব্রাহ্মধর্ম" নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০১] স্তোত্রটির পরিমার্জিত সংস্করণে ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ এর নির্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদমূলক বর্ণনাত্মক বিশেষণগুলি বর্জন করেছিলেন। তন্ত্রের গুরুবাদ, সাকার উপাসনা প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মগণের নিকট অপকৃষ্ট মনে হলেও, তন্ত্র যে মূলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন।[১০২] পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ১৮৪৪-৪৫ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মসমাজে মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী দীক্ষাপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৫০এর পর তা বর্জিত হয়।[১০২ক] কিন্তু ক্রমশঃ তন্ত্রের প্রতি এই অবশিষ্ট শ্রদ্ধাটুকুও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ব্রাহ্মসমাজ নিজ সমন্বয়াদর্শ থেকে তান্ত্রিক ব্রাহ্মবাদকে প্রায় নির্বাসিত করে দেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কৃত 'গায়ত্রী ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাড়া এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথোত্তর যুগের ব্রাহ্মনায়কগণের অন্য কোনও রচনা বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয় নি।[১০৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে রামমোহনের গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা পূর্বে কোনও লেখকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি তা নয়। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সার্ জন উড্‌রফ্, সুবিখ্যাত লেখক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্বে রামমোহনের প্রতিভার এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১০৪] এঁদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি, সেগুলির একদেশদর্শিতা। তাঁরা তিনজনেই বলেছেন, রামমোহন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সে মতবাদও তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মহানির্বাণ তন্ত্রের কয়েকটি (সবগুলি নয়!) সর্গ থেকে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা অন্য কোনও তন্ত্রগ্রন্থের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি! এই সিদ্ধান্ত একটি দুর্বল অতিশয়োক্তি মাত্র। রামমোহনের চিন্তাধারার গঠন ও পরিণতির উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব যেমন উপেক্ষণীয় নয় তেমনি তাকে অতিরঞ্জিত করবারও কোনও সার্থকতা নেই। এতে তাঁর প্রতি সুবিচার হয় না। তন্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে মহানির্বাণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও দেখা যাবে রামমোহন সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করেছেন কুলার্ণবের সাক্ষ্য। তাছাড়া কৌল শাস্ত্রে তাঁর অধ্যয়ন ছিল সুবিস্তীর্ণ, কেবলমাত্র কুলার্ণব-মহানির্বাণ-ভিত্তিক নয়। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে রামমোহন বেদবেদান্তকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রামাণ্য স্বীকার করলেও স্পষ্টতঃ সেগুলিকে বেদবেদান্ত অপেক্ষা নিম্নস্তরের জ্ঞান করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় প্রথম থেকেই বেদ-উপনিষদের প্রাধান্য ছিল, তন্ত্রশাস্ত্রের কোনও স্থান তার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। যে তন্ত্রবচন রামমোহন তাঁর উপাসনাপদ্ধতির অঙ্গীভূত করেন, তা সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত উপাসনাতেই সে যুগে ব্যবহৃত হত, সামাজিক উপাসনাতে নয়। রামমোহন ছিলেন মূলতঃ বৈদান্তিক, তন্ত্রশাস্ত্রদ্বারা তাঁর দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত হলেও, তন্ত্র তাঁর নিকট বেদান্তের পরিপূরক হিসাবেই মূল্যবান ছিল। উপরি-উক্ত লেখকত্রয়ের উক্তি অনেক পরিমাণে প্রচলিত কিংবদন্তী-নির্ভর, এবং সেই কারণে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রামমোহন কেবল উপনিষদকে আশ্রয় করেছিলেন বলেই তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় প্রচেষ্টা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে; ভারতীয় সভ্যতার পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে তিনি বুঝতে পারেননি।[১০৫] এই সিদ্ধান্তও সমানভাবে ভ্রান্ত। ভারতীয় সভ্যতার গতিশীল চরিত্রটি রামমোহন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন বলেই বেদ-উপনিষদকে আশ্রয় করেও নিজেকে তার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। গভীর মনীষা ও শ্রদ্ধার সহিত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলিরও অনুশীলন করেছিলেন। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম, মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলন, খ্রীষ্টধর্ম, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কোনও কোনও অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর আলোচনার বস্তু ছিল। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর শাস্ত্রালোচনার ও সমন্বয়-প্রচেষ্টার এ যাবৎ প্রায় উপেক্ষিত একটি দিকের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

প্রমাণপঞ্জী

১. শিখ ও ব্রাহ্ম ধর্মদ্বয়ের এই বিষয়ে পরস্পর সাদৃশ্য উদাহরণ হিসাবে বোধ করি সার্থকতম। জনৈক বিখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের এই দুটি সমন্বয়মূলক ধর্মাদর্শের স্বভাব-বৈপরীত্যের উপরে সম্প্রতি অতিমাত্রায় জোর দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, Vol. V p. 106)। যদি তর্কের খাতিরে তাঁর মতামত স্বীকার করে নেওয়াও যায়, তা হলেও এ কথা সত্যই থাকে যে এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি আদি ও উত্তর কাণ্ডের প্রভেদ সমানভাবে স্পষ্ট। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের বিবর্তন ও পরিবর্তন তাদের স্ব স্ব স্বভাবনিরপেক্ষ সার্বজনীন সত্য।

২. *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Edited by Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Part IV (Calcutta 1947), pp. 71-72.

৩. *The Father of Modern India*, Raja Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume, Part II, (Calcutta 1935) p. 162.

৪. রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসুর প্রতি তাঁর উক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬১৩-১৪ ; চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ক কথোপকথন নিজেই ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, দ্রষ্টব্য তাঁর "Reminiscences of Rammohun Roy" শীর্ষক দুটি রচনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃ ১৩৯-৪০ ; মাঘ ১৭৯৪ শক, পৃ ১৭৪-৭৫ ; লক্ষ্য করবার বিষয়, চন্দ্রশেখর দেবের নিকটেও রামমোহন বলেছিলেন অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ে ভারতীয় বেদবেদান্তই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র। রামমোহনের সার্বভৌম ধর্মদৃষ্টি সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, পৃ ১৫৯।

৫. *Calcutta Review*, Vol. IV (1845) pp. 355-93

৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৬৮ শকাব্দ, পৃ ৩৮১

৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৭৭২ শকাব্দ, পৃ ১৬০-৬১

৮. এই ট্রাস্টডীডখানি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের *History of the Brahmo Samaj* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিশিষ্টরূপে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাব্দ, "ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ," পৃ ৯১ ; ফাল্গুন, ১৭৮২ শকাব্দ, "ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত" (লেখক রাজনারায়ণ বসু), পৃ ১৪৪

১০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাব্দ, পৃ ৯১

১১. রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু ও শিষ্য একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, উইলিয়ম অ্যাডাম পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ

প্রতিষ্ঠায় খুশি হতে পারেন নি। কেননা তাঁর প্রত্যাশা ছিল, রামমোহন খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদের দিকেই বেশি করে ঝুঁকবেন (দ্রষ্টব্য Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (London 1900), p. 90) ; কলিকাতার ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই। তাঁরা এতকাল ভেবে এসেছিলেন রামমোহন শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন এবং ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে তিনি মিশনারি সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সহায়ক হবেন। হিন্দুধর্মের বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না, এ বিষয়ে রামমোহনের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার ও তাঁদের ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের ফলে তাঁদের আশাভঙ্গ হয় এবং তাঁরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার ইংরাজসমাজের অন্যতম মুখপত্র *John Bull* পত্রে "জনৈক খ্রীষ্টান" স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার তীব্র নিন্দাসূচক যে চিঠি প্রকাশিত হয়, এবং উক্ত বৎসর ১৬ই অক্টোবর তারিখে ঐ পত্রিকাতেই রামমোহন ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে যে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলি এই আশাভঙ্গজনিত বিলাপ ছাড়া আর কিছু নয় (দ্রষ্টব্য J. K. Majumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India: A Selection from Records*, Nos. 37 and 39, pp. 82, 85-86).

১২। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬৩৩

১৩. রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের প্রাথমিক শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালীন দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখেছেন : "যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পালকিতে উঠান গেল, তখন, তিনি পৌত্তলিক নহেন, তখনকার ব্রাহ্মধর্ম অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ইহা গ্রামস্থ লোকদিগকে দেখাইবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনার কোন্ ধর্মে মৃত্যু হইতেছে, সকলকে বলুন। তিনি বলিলেন 'বৈদান্তিক ধর্মে'।"—রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৪৪

১৪. রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৮০, পৃ ৮১২

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫৬, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৮৯

১৬. বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ পৃ ১৩ ; অতঃপর রামমোহনের যে সকল গ্রন্থাদি উল্লিখিত হয়েছে তা সবই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ রামমোহন-গ্রন্থাবলীভুক্ত, প্রতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সে কথা উল্লেখ করা হল না। উল্লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা ঐ গ্রন্থাবলীর।

১৭. তলবকার উপনিষৎ পৃ ১৮৭ ; ঈশোপনিষৎ পৃ ১৯৫ ; কঠোপনিষৎ পৃ ২১২ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পৃ ২৪৭

১৭ক. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৫-৫৬

১৮. বৈদান্তিক ও বেদান্তভাষ্যকার রূপে রামমোহনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত রচনাগুলি দ্রষ্টব্য :

ক. চন্দ্রশেখর বসু, বেদান্তপ্রবেশ, কলিকাতা ১২৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪৮-৬৫

খ. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়, পৃ ৪৪-১৬৫

গ. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা পৃ ২৩২-৪৪

ঘ. ঈশানচন্দ্র রায়, 'Rammohun as a Bhasyakara', *Indian Messenger* Vol. LVIII, No. 3 (Maghotsava Number 1940), pp. 51-52

১৯. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য ১।২।৪

২০. ব্রহ্মসূত্র, রামমোহন-ভাষ্য ৪।১।১২— বেদান্তগ্রন্থ পৃ ১০১ ; এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য, রামমোহনকৃত বেদান্তসার পৃ ১২৪

২১. দ্রষ্টব্য সদানন্দকৃত বেদান্তসার, ৪ : "এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনমুপাসনানাং তু চিত্তৈকাগ্র্যং ·" (জি. এ. জেকব-কৃত সং পৃঃ ৪) ; রামতীর্থ তাঁর বেদান্তসারের টীকায় এ বিষয়ে আরও বিশদ-ভাবে বলেছেন : "শাস্ত্রবোধিতে সগুণে ব্রহ্মণি দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্যোপেতমনোবৃত্তিস্থিরীকরণলক্ষণানি উপাসনানি" (উক্ত সংস্করণ, রামতীর্থকৃত বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা পৃ ৭৩)।

২২. অনুষ্ঠান পৃ ৬৭

২৩. ঐ, পৃ ৬৯

২৪. ব্রহ্মোপাসনা পৃ ৫২-৫৩ ; ক্ষুদ্রপত্রী পৃ ৭৫-৭৬

২৫. অনুষ্ঠান পৃ ৬৮

২৬. ঈশোপনিষৎ পৃ ১৯৮, ১৯৯ ; ব্রহ্মসূত্র, রামমোহন ভাষ্য ৩।৪।৪৮ (বেদান্তগ্রন্থ, পৃ ৯৮)

২৭. সুশীলকুমার দে, *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* (Calcutta 1942) pp. 10-16

২৮. উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে।

পঞ্চদশী ৯।৭৪, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কৃত সং, পৃ ৫৬৬-৬৭

২৯. গোস্বামীর সহিত বিচার পৃ ৫৫ ; ইদানীংকালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*এ নানা যুক্তি প্রয়োগে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন, চৈতন্যবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক যোগ মধ্বব সম্প্রদায়ের সঙ্গে নয়, শঙ্করপন্থিগণের সঙ্গে। রামমোহনের "গোস্বামীর সহিত বিচার" গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে ডাঃ দে দেখতে পেতেন ১২৪ বৎসর পূর্বে রামমোহন অবিকল একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। "গোস্বামীর সহিত বিচার" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

৩০. চৈতন্যদেবের অবতারত্বের বিরুদ্ধে রামমোহনের উক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, পথ্যপ্রদান পৃ. ১৩২-৩৪ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতসম্মত লীলাদির নিত্যতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি স্মরণীয় : "পূর্বে যে সকল অধিকারী দুর্বল ছিলেন, তাঁহারা মনস্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী

করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে……"—গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬৩।

৩১. দ্রষ্টব্য ১৮ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত তাঁর প্রবন্ধ।

৩২. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮-২৬

৩৩. রামানুজ এবং তাঁর সম্প্রদায় রামমোহনের অজ্ঞাত ছিলেন না যদিও তাঁর বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে রামমোহন রামানুজকে অনুসরণ করেন নি। দ্রষ্টব্য, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ২১-২২, ২৫-২৬, ৩৫, ইত্যাদি; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩৫-৩৬; ১৩৮

৩৪. শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তন্ত্রকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ভূমিকা

৩৫. উপরি-উক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা

৩৬. উপরি-উক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৬-৩৫

৩৭. কুলার্ণব তন্ত্র ৯।৩২, Tantric Texts Series, Vol. V, London 1917, p. 127

৩৮. Surendranath Dasgupta, "General Introduction to Tantra Philosophy," *Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Volume*, Vol. III, Part I, p. 255

৩৯. Chintaharan Chakravarti, "Tantra and Vedanta", *Kalyana-Kalpataru*, Vol III, No 1, p. 176.

৪০. মহানির্বাণ তন্ত্র ২।৫২, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১০

৪১. কুলার্ণব তন্ত্র ১৭।২৯, Tantric Texts Series, Vol. V, p. 257; এই প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার যথার্থ বলেছেন, "Tantric Yogis who pursue the path of knowledge regard the path of devotion as indispensable…"—Introduction, *The Principles of Tantra*, Translated by Arthur Avalon, Part II, p. cxlvii

৪২. শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তন্ত্রতত্ত্ব, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কাশী ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮১; আরও দ্রষ্টব্য H. V. Guenther, *Yuganaddha: The Tantric View of Life*, Chowkhamba Sanksrit Series Studies Vol. III, Introduction p. ii

৪৩. যেন সর্বফলাবাপ্তিঃ সর্বেষাং বন্ধুরেব যঃ
সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ
তং ব্রূহি ভগবন্মন্ত্রং মম সর্বার্থসিদ্ধয়ে।

গৌতমীয় তন্ত্র ১।৭-৮, বসুমতী সং, পৃ ২

৪৪. মহানির্বাণ তন্ত্র ১৪।১৮৫-৮৬, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১৮৭

৪৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬০২, পাদটীকা।

৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৯, পৃ ২৬-২৭

৪৭. R. P. Chanda and J. K. Majumder, *Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy*, Calcutta. 1938, p. 174

৪৮. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃ ১৭০, ১৭১, ১৭৫ ; ঈশোপনিষৎ, পৃ ১৯৬, ১৯৭ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃ ২৪৫ ; ২৪৬-৪৭ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৬৯-৭০, ৭০, ৭৯, ৮৩, ৮৯-৯০ ; প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, পৃ ৪০-৪১ ; গায়ত্রীর অর্থ, পৃ ৩ ; চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৭, ১৮, ১৯ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ৯২, ৯৩, ১০১-১০২, ১৪০, ১৫২ ১৬১, ১৬৪, ১৬৬-৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১ (দুইবার), ১৭২, ১৭৬

৪৯. ঈশোপনিষৎ, পৃ ১৯৬ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পৃ ২৪৫ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ৩৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৮১, ৯১ ; গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানম্, পৃ ৪০ ; ব্রহ্মোপাসনা, পৃ ৫২-৫৩ ; অনুষ্ঠান, পৃ ৭১ ; ব্রাহ্মণেসেবধি, পৃ ১৪ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ৯২, ১০৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬

৫০. ঈশোপনিষৎ, পৃ ২০৩ ; ব্রাহ্মণসেবধি, পৃ ১৬ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১০৯, ১১৪

৫১. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৯, ২১, ৩৭ (দুইবার) ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৯১

৫২. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৪

৫৩. পথ্যপ্রদান, পৃ ৯২, ১৫৪

৫৪. পথ্যপ্রদান, পৃ ১০০, ১৫২, ১৬৬

৫৫. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৪৬, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭

৫৬. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৫৪

৫৭. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬১, ১৬৭

৫৮. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬২, ১৬৩

৫৯. পথ্যপ্রদান পৃ ১৬৫

৬০. পথ্যপ্রদান পৃ ১৬৬

৬১. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬৫, ১৬৬

৬২. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩২-৩৩, ১৪১-৪২

৬৩. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩৩-৩৪, ১৭৫

৬৪. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮, ২৩ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৫

৬৫. কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৭৫ , পথ্যপ্রদান, পৃ ১৫০

৬৬. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬১-৬২, ১৬৩

৬৭. সময়াতন্ত্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৫৭ ; অন্যান্য বিধির উল্লেখ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃ ১৭৪ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩৬, ১৫৪, ইত্যাদি।

৬৮. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৭৫

৬৯. ঈশোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃ ১৯৫-৯৮ ; বেদান্তগ্রন্থ-ভূমিকা, পৃ ৬

৭০. ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২, পৃ ১৬ ; আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত বিচার পৃ ৪৬-৪৭

৭১. ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২, পৃ ১৪-১৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৪৯-৫০ ; পথ্যপ্রদান পৃ ১৩২-৩৩ ; কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, পৃ ১৮৪

৭২. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, রামমোহন-গ্রন্থাবলী সা. প. সং, পৃ ৫২ ; রামমোহনের উত্তর পথ্যপ্রদান পৃ ১৩২-৩৪

৭৩. Maha-Nirvana-Tantram, Edited by Arthur Avalon, Introduction, pp. vii-viii ; রামমোহনের হস্তলিখিত হরিহরানন্দ-কৃত মহানির্বাণতন্ত্রের এই টীকাটির পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথায় আছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

৭৪. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, রামমোহন-গ্রন্থাবলী সা. প. সং, পৃ ৭৩-৭৪

৭৫. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬৪-৭৭

৭৬. সাম্প্রদায়িক ও সাকার উপাসনার সমর্থক তন্ত্রগ্রন্থগুলি সম্পর্কে রামমোহনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ৩৭, ৩৯ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫০, ৫৪-৫৫ ইত্যাদি ; মারণ উচাটনাদি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃ ১৬৮ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬৯

৭৭. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, পৃ ৯৮ ; আরও দ্রষ্টব্য, পথ্যপ্রদান, পৃ ৯৩, ইত্যাদি

৭৮. ব্রহ্মোপাসনা, পৃ ৫২-৫৩ ; মহানির্বাণ তন্ত্র ৩৷৫৯-৬৩, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১৫-১৬ ; ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের রূপ এবং লীলা নিত্য, কিন্তু তন্ত্রের দৃষ্টিতে এগুলি দুর্বল অধিকারীর উপকারার্থে কতগুলি কল্পনা মাত্র, এ সবের পারমার্থিক সত্তা নেই। সুতরাং নিরাকারবাদী রামমোহনের দৃষ্টিতে তান্ত্রিক ভক্তিবাদ অপেক্ষা বৈষ্ণব ভক্তিবাদ স্বভাবতঃ উৎকৃষ্টতর মনে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কুলার্ণবের উক্তি স্মরণীয় :

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

—কুলার্ণব ৬৷৭২, Tantrik Texts Vol. V p. 88

৭৯. গায়ত্রীর অর্থ, পৃ ৩-৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, অনুষ্ঠান পৃ ৬৯, ৭১, ৭৩

৮০. দ্রষ্টব্য "গায়ত্রীর অর্থ", "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ", পৃ ৩২-৩৩, "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্", "অনুষ্ঠান" পৃ ৬৯ ইত্যাদি

৮১. শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "তান্ত্রিক কার্যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ," বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৯শ খণ্ড, পৃ ৩৫-৩৭

৮২. তন্ত্রসার, বসুমতী সংস্করণ, পৃ ৮২-৮৩

৮৩. মহানির্বাণ তন্ত্র ৩৷১০৫-১১৪, বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১৯ ; গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্", পৃ ৪০

৮৪. কুলার্ণব তন্ত্র ২৷২৪ ; ৯৷৬৩, Tantrik Texts Series Vol. V pp. 19, 131

৮৫. মহানির্বাণ তন্ত্র ৮৷২২-২৫, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৭২-৭৩

৮৬. মহানির্বাণ তন্ত্র ৮৷২০৬-২০৭, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৮৫

৮৭. J. K. Majumder, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, Calcutta 1941, pp. 112-14

৮৮. মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃ ২৪৩; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৭৩; কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, রামমোহন-গ্রন্থাবলী সা. প. সং, পৃ ৫৬; পথ্যপ্রদান, পৃ ৮৫

৮৯. শ্রীহেমলতা দেবী, "ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন", *The Father of Modern India*: Rammohun Centenary Commemoration Volume, Part II, pp. 282-84

৯০. মহানির্বাণ তন্ত্র ১০।৭৯, বঙ্গবাসী সং পৃ ১১৯

৯১. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, পৃ ৪৫

৯২. মহানির্বাণ তন্ত্র ৮।৪৭, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৭৪

৯৩. চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৯-২০; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৫৩-৫৪; মহানির্বাণ তন্ত্র ৮।১৭৭-৮১, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৮৩-৮৪

৯৪. চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৭-১৯; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৪৩-৫২, ১৫৯-৭৮; "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার" পুস্তিকায় এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণও দেওয়া হয়েছে।

৯৫. S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Ist ed. p. 3; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ১৫

৯৬. জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ —তন্ত্রসার, বসুমতী সং, পৃ ৩৫

আরও দ্রষ্টব্য হরকুমার ঠাকুর, পুরশ্চরণবোধিনী, দশম সং, কলিকাতা, পৃ ৩; পুরশ্চরণরত্নাকর, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সংকলিত, কলিকাতা ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬

৯৭. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ পৃ ৪০-৪১

৯৮. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সং, পৃ ৬০১-০২, পাদটীকা

৯৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ১৯২৭, পৃ ২৩০-৩১

১০০. উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২২৯-৩০

১০১. ব্রাহ্মধর্মঃ, নবম সং, কলিকাতা ১৯৩৭, পৃ ১২-১৩

১০২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৯০ শক, পৃ ২১৯-২০

১০২ক. Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj* Vol. I (Calcutta, 1911) pp. 96-97

১০৩. গায়ত্রীমূলক ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন, দ্বিতীয় সং কলিকাতা ১৮৩৭ শক; প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীসুরথ চক্রবর্তী পুস্তিকাখানি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

১০৪. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্রশাস্ত্র", বিবিধ প্রবন্ধ, (দ্বিতীয় সংস্করণ, চুঁচুড়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ১৪৩-৪৯; Arthur Avalon, Mahanirvana Tantram p. vii; পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় কৃত অ্যাভেলনের মহানির্বাণ তন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা, সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২০ পৃ ৩৬৩-৬৮

১০৫. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৪৫, পৃ ৪৬

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

ভবতোষ দত্ত

সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ঔপন্যাসিকরূপে, যেমন রবীন্দ্রনাথ পরিচিত কবিরূপে। এ বিষয়ে সংস্কার এতই দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে তাঁদের যে অন্যবিধ পরিচয় আছে, তা আমাদের মনে সব সময় থাকে না; অন্ততঃ বিচারবোধ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাঁদের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণে এই সংস্কার অনেক সময়েই দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে থাকে। বাংলা দেশের সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের দিক দিয়ে দুজনকে দুই যুগে যে ভাবে অধিনায়কত্ব করতে দেখি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁদের এই ভূমিকার মূলে আছে এক দুঃসাধ্য মননসাধনা। তাঁদের দৃঢ় বিচারবোধ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট আকৃতিকে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। যদিও দেখা যাবে দুজনের কর্মপথ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে ধাবিত, কিন্তু মানুষের পরম মূল্যে তাঁরা বিশ্বাস অটুট রেখেছেন। এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই তাঁরা মানুষের দোষ ত্রুটি এবং মহত্ত্বকে মিলিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন। এজন্য তাঁদের মনীষার তুলনা যথেষ্ট কৌতূহলজনক হবে বলেই মনে হয় এবং তার মধ্যে শিক্ষণীয়তাও কিছু কম থাকবে না। এ বিষয়ে সোজাসুজি উদ্যোগী হওয়ার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক মনোভাবের সন্ধান নেওয়াও সংগত।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়ে বালকচিত্তে তার প্রভাবের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ পড়েন তাতেও বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাবকে তিনি সম্রাটের প্রথম সমাগমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রথম বর্ষার জলধারা বালক যুবা প্রৌঢ় গৃহিণী এবং বধূ সকলেরই হৃদয়তলকে রসসিক্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, বয়স বারো কি তেরো। মধ্যাহ্নের শান্ত প্রহরগুলি বঙ্গদর্শনের পাতা উল্‌টে কেটে যেত— সে-তন্ময়তার কথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের পরিচয় এর আগেই হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্কিমের বন্ধু। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো অংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশের জন্য বঙ্কিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন।[১] "বঙ্কিমবাবু বোধহয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কিনা আমার স্মরণ নাই। কিন্তু উঁহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।" স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম সর্গটি অবশ্য বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে সাহিত্যিক আদর্শ স্থাপিত করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই পথের পথিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে বাঙালীদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত হল বটে, কিন্তু তাদের সংহত করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩০৮এ রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়ে লিখেছিলেন "তখনকার সেই নির্ঝরধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্বত্রই

---

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৯৩।

যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।" এই বিচিত্র ভাবের বন্যায় বাঙালী পাঠক প্লাবিত হয়ে গেল। বঙ্গদর্শনের এই ভাবুকতার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন। তখন তাঁর বয়স অল্প। উপন্যাসের রোমান্স এবং ছবিগুলি তাঁর বালক-মনকে যতটা আকৃষ্ট করবে প্রবন্ধ তাকে ততটা আকৃষ্ট করবে না, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারেই একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অন্যান্যরাও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গ্রন্থিবন্ধন যে এঁদের দ্বারাই হয়েছিল, তার জন্য কোনো প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন উপলক্ষে মরকতকুঞ্জে। 'জীবনস্মৃতি'তে এবং 'সাধনা'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্পষ্ট রেখায়িত ছবি এঁকেছেন যাতে শুধু দৈহিক রূপটি নয়, অন্তরের রূপটিও অসাধারণ তীক্ষ্ণতায় ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়বার দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে নেন বাংলার প্রধান লেখকদলের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও রসসৃষ্টির শক্তি তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে মহিমাপূর্ণ আসনে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তরুণ বাঙালীর কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র। নিভৃতে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের আদর্শ মনে মনে লালন করলেও বঙ্কিমের কাছে স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম থেকেই গভীর স্নেহ পোষণ করেছেন। বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের যে ধরণের কবিতা প্রকাশিত হত, রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম দিকে তার কিছু কিছু অনুকরণ করেছিলেন কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) কিংবা সন্ধ্যাসঙ্গীতে (১৮৮২) সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি এবং আদর্শকেই অবলম্বন করেছিলেন। অথচ এই দুটি গ্রন্থ সম্পর্কেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।[২] জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আহূত বিদ্বজ্জনসমাগমে (১২৮৭, ১৬ ফাল্গুন) 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় উপস্থিত ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,[৩]

"যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে [বাল্মীকির কবিত্ব লাভ পরিচ্ছেদে] রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।"— বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন।

পরের বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হল। এই বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি হয়েছিল তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন জীবনস্মৃতিতে—

"সন্ধ্যাসঙ্গীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি— রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর

---

২ 'চার অধ্যায়'এর ভূমিকায় (প্রথম সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই তাঁর কাব্যের প্রথম অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ করেছিলেন।— রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পৃ ৫৪১। এই উক্তি ঠিক নয়।

৩ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনস্মৃতি' ১৩৬৩, পৃ ২১১-১২।

গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই (১২৮৯ সাল, ২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোয় স্থাপিত সারস্বত সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র হন সহ-সভাপতি। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। এই সমাজের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র; এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও সহযোগী-সভাপতি ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু যোগ দেন নি। সেই বৎসরেই ২৩এ জানুয়ারি ১১ই মাঘের উৎসবে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যান। সরলা দেবী চৌধুরানী 'জীবনের ঝরাপাতা'য় সম্ভবত এই দিনের স্মৃতিই লিখেছেন—

"একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল— দীর্ঘনাসা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি বঙ্কিম।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সরলা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ভারতীতে সরলা দেবীর 'রতিবিলাপ' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে বঙ্কিম নিজেই চিঠি লেখেন প্রশংসা করে। নিজের একসেট বইও বঙ্কিম নবীনা লেখিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে মধুর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সরলা দেবী বঙ্কিমের 'সাধের তরণী' গানটিতে সুর দেন। 'শতগান'এ তার স্বরলিপিও দেওয়া আছে।

ঠাকুর-পরিবারের লেখক লেখিকা সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল যদিও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির আগে একটি ঘটনা ঘটে যা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরে প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা 'ললিতা ও মানস' এই বইতে ছাপা হয়েছিল। ১২৮৫র ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় 'কবিতাপুস্তকে'র কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'ভারতী'র সম্পাদক।

"আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর 'কবিতাপুস্তক' আমাদিগের ভাল লাগিল না— জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থান পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

এর পরেও 'ভারতী'তে বঙ্কিম সমালোচিত হয়েছিলেন। ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যায় জনৈক লেখক 'শকুন্তলা' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের শকুন্তলা সমালোচনার প্রতিকূল বিচার করেছিলেন। এরও প্রায় দশ বৎসর পর ১২৯৭এর কার্তিক মাসে 'ভারতী'তেই 'কাব্যের উদ্দেশ্য' নামে একটি প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বঙ্কিমের রসসৃষ্টির মতবাদকেই আক্রমণ করা হয়েছিল। এইসব সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ হয়তো ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমের সম্বন্ধে কোনো অন্ধতাও যে ছিল না, এর থেকে সেটাও বোঝা সহজ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বঙ্কিমের যে বিখ্যাত মতভেদ ঘটে সেটা ১৮৮৪র ঘটনা। বঙ্কিমের উক্তিতেই জানা যায় লিখিতভাবে বঙ্কিমের মতের প্রতিবাদের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো মনোবাদ ঘটে নি। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের কাব্যের এবং সাহিত্যিক মতবাদের প্রতিবাদ হলেও ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগে কোনো ফাটল ধরে নি। একালের কোনো কোনো লেখক বঙ্কিম সম্পর্কে ঈর্ষা এবং সংকীর্ণতার ইঙ্গিত করেছেন বলে এই ঘটনাগুলিকে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবনে' (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) এবং বঙ্কিমের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রচার'পত্রে (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রধান লেখক। এই দুই পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথও গদ্য পদ্য রচনা দিয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাদবিতর্ক আরম্ভ হল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত তাঁর সমালোচনার উত্তর দিতেন না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত বলেই বঙ্কিম উত্তর দিয়েছিলেন এবং প্রত্যুত্তরের আর উত্তর দেন নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে অসাধারণ শালীনতা এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র করে লিখেছিলেন—

"এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

তার অন্য প্রমাণও আছে। এর কিছুদিন পরেই 'ভারতী'র লেখক-গোষ্ঠীতে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। আর-একটি প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষের দিকে রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্ররচনাবলী প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বঙ্কিমের একটি চিঠি স্মরণ করেছেন—

"সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এসেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"[৪]

---

৪ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আছে: "রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন?' উত্তর— 'পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধহয় রবি বেশি 'গিফটেড' কিন্তু 'পৃকোসাস', এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সেদিন রবিকে বলেছি।'" সুরেশ সমাজপতি, 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' পৃ ১৯৬।

রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের আলোচনা করেছেন।[৫] রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন বিচারবোধ যে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এই গদ্য রচনাগুলিতে স্পষ্টতই তার আভাস আছে। স্পষ্ট ভাষণের সাহসও দেখা গেল বঙ্কিমের সঙ্গে বিতর্কে। এর পরে আরো দুটি ঘটনা যোজনা করা যায়। ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র চিঠি লিখে জানান 'প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।' ১৩০০ সালে চৈতন্য লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে প্রবন্ধ পড়েন। সে সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সম্ভবত মৃত্যুর পূর্বে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ সভায় যোগদান।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের এই বিবরণ অসম্পূর্ণ। অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আরো সংগ্রহ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আরও বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। এখানে আমরা মূল আলোচনার পটভূমিরূপে দুজনের প্রতি দুজনের মনোভাবের একটা আভাস মাত্র দিলাম।

আমাদের মূল আলোচনা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্ক থেকেই আরম্ভ করব। এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোঝা সহজ হবে। তবে এটা মনে রাখা দরকার বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর মনীষার পরিণত স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা তখন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। 'সত্য' বলতে কি বোঝায় ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। বঙ্কিমের চিন্তার প্রণালী এবং বৈশিষ্ট্য যাঁরা অনুধাবন করেছেন, তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন বঙ্কিমের সত্যের ধারণা 'মিস্‌টিক্যাল' বা অতীন্দ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর যুক্তি এবং বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে কোনো অনির্দিষ্টতা থাকবার কথা নয়। উপনিষদের ঋষি যে সত্যধর্মের কথা বলেছিলেন, যার ব্যাখ্যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যকেও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যান নি। সেই ব্যাখ্যাতে সেকালের সমাজের প্রয়োজন কিছু মিটত না, পুরনো দর্শনের বড় জোর আর-এক নতুন ভাষ্য হত মাত্র। সত্যের যে পর্যায় আচার্য শঙ্কর স্থির করেছিলেন যুক্তির দিক দিয়ে তা অনতিক্রম্য। শঙ্করের সত্য-ধারণাতে সৃষ্টির খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়রূপেরই যথাযোগ্য স্বীকৃতি আছে। তবু শঙ্করের বৈদান্তিক মতবাদ খণ্ডের পূর্ণ মর্যাদা দিতে শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুপ্রেরিত করে নি। ফলে কর্ম-সাধনার দিক দিয়ে আমাদের জীবনে শূন্যতাই রয়ে গিয়েছে। মধ্যযুগের সমাজে বেদান্তের চর্চা হ্রাস পেয়েছে। উপনিষদেরই আর-এক ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি হল। ঈশ্বর লীলাময় বলেই তাঁর বহু বিচিত্র লীলা রচনা করতে বৈষ্ণবরা অনেক নতুন আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছেন। ভগবানকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করাতে ভক্তের সঙ্গে যেন প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে উঠল। আনুষ্ঠানিকতার উদ্ভবের বীজ নিহিত ছিল এখানে।

এই ধর্মবিশ্বাস এক দিকে যেমন বৈরাগ্যপ্রবণ করে তুলল তেমনি গৃহী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিস্তার ঘটাল। স্মার্ত ধর্ম নামক যে বিশ্বাস বহু পূর্বকাল থেকে চলে এসেছে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির ধর্ম সেটা নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যক্তির কর্তব্যপালনের বিধিনিষেধ দিয়ে স্মৃতির বিধান। বৈদিক গৃহ্য এবং ধর্মসূত্র থেকে স্মৃতির উদ্ভব, মধ্যযুগের জটিল আচারের জালে তার বিস্তার। আদিতে স্মৃতির ছিল তিনটি শাখা, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত। তার থেকে আহ্নিক সংস্কার শুদ্ধি

৫ ভারতী ১২৯০ অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩১ 'বাউলের গান'।

প্রায়শ্চিত্ত শ্রাদ্ধ কৃত্য পূজা প্রতিষ্ঠা দান কাল ব্যবহার বিবাদ রাজধর্ম ইত্যাদি বহুবিধ কর্তব্য নির্দেশের ব্যবস্থা হল। ব্যক্তি ও পরিবারের প্রাত্যহিক কর্তব্য থেকে সনাতন সমাজগত কর্তব্য পর্যন্ত সর্বত্র স্মৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চৈতন্য-যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশে অন্ততঃ চোদ্দ জন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতের নাম পাই। তাঁদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের বিধানই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে দীর্ঘকাল শাসন করে এসেছে। রঘুনন্দন পূর্ববর্তী বিধানের কতকগুলি গ্রহণ করেছেন, কতকগুলি মার্জনা করেছেন, কতকগুলি নিজে রচনা করেছেন। যে-কালে রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সে কালে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন—

"স্মার্ত রঘুনন্দন একজন বিষম protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব ভারতবাসীর বৈদিক গোঁড়ামির অপহ্নবকর্তা। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব এবং অতুল্য। তাঁহারই প্রভাবে বাংলায় আচারীদিগের 'ছুৎমার্গ' দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই।"

তবু এইসব আচার-বিচারের পশ্চাৎপটে ঠিক কোন্ গভীরতর দার্শনিক যুক্তি ছিল, জানি না। এ নিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনাও অনাবশ্যক। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সমাজ যে আচারের জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছিল তাতে অর্থহীন অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটি চিঠিতে বঙ্কিম রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখেছিলেন—

"স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে— বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে— ইহা অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন— হিন্দুধর্ম সনাতন— তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে।"

অথচ এইসব বিধি-নিয়মগুলির পিছনে হয়তো একটা সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি ছিল। বৌদ্ধদের শীল আত্মিক উপলব্ধির জন্য নয়, ব্যক্তির মনকে সংযত করার জন্য। হিন্দুধর্মের উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় যে সত্যের ধারণা ছিল। তার সঙ্গে এই আনুষ্ঠানিকতার যোগ যে কোথায় ঠিক বলা যায় না। যেখানেই থাক্, এ যে অনিবার্যভাবে সত্যবোধে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নি, তা বলাই বাহুল্য। মনের যে বিকাশ ঘটলে মানব-কল্যাণ ও ব্যক্তিগত শুচিতার যুক্তি-বুদ্ধি স্বয়ম্প্রকাশ হয়, সেই বিকাশের দ্বার রুদ্ধই ছিল। গীতায় যে নীতিসর্বস্বতার উর্ধ্বে যাওয়ার আহ্বান আছে, সেটা তো চিত্তোন্নতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রশস্ত দৃষ্টিই মানুষকে কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা এনে দেবে। আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, মধ্যযুগে আচার-সর্বস্বতা অন্ধতার সৃষ্টি করে চিত্তোন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। উচ্চতর দার্শনিক সত্যবোধকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যদি নাও পেয়ে থাকি, তবু এর একটা অলক্ষ্য প্রভাব আমাদের জীবনাচরণে থেকে গিয়েছে। সত্যকে ধ্রুব বলেই জানি, তাই আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম স্থিরতাপন্থী হয়ে সামাজিক অচলতার সৃষ্টি করেছে। আমরা বরণ করে নিয়েছি অভ্যাসকে।

সমাজজীবনের এই জড়তার বিরুদ্ধে রামমোহন যুদ্ধ করেছিলেন। মধ্যযুগের সংকীর্ণ সত্য ধারণাকে অস্বীকার করে তিনি জীবনের কল্যাণবোধকে উদারতর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সামাজিক সংস্কার-কর্মগুলি কোন্ প্রবল সর্বব্যাপী সত্যের অনুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আনুমানিক উত্তর ছাড়া এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া কঠিন। তিনি

ছিলেন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী। নির্গুণ ব্রহ্মচেতনা তাঁকে কেমন করে সংসারের কর্মভার তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অর্থাৎ সত্যের কোন্ রূপ তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন যার জন্য সাধক রূপান্তরিত হলেন কর্মীতে? রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রসঙ্গে বার বার সত্যসাধনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে যে দেশাচার সমাজকে বিশ্বমানব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, রামমোহন তাকেই ঘুচিয়ে বৃহৎ ঐক্যের কথা প্রচার করতে এসেছিলেন। রামমোহনের সত্যধারণা ঐক্যবোধের উপরেই স্থাপিত। তিনি যে অদ্বৈতপন্থী হয়ে প্রতিমাপুজা ও ধর্মের অন্যান্য সংকীর্ণতার বিরোধিতা করেছিলেন, সেটা এই ঐক্যবোধ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু এই ঐক্যবোধ এবং ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। বরং বলা যায় তাঁর প্রখর বুদ্ধির জাগরণের ফলে যেসব দিক দিয়ে তাঁর মনে ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছিল, ধর্ম তাদের অন্যতমমাত্র। এ জন্য প্রত্যাশিত শান্তরসাশ্রিত জীবন তাঁর নয়। তাঁর জীবন ছিল বজ্রদীপ্ত কর্মময়।

এই বুদ্ধি নীতিরই বুদ্ধি। রামমোহন সমাজের সংস্কারে বাঙালীকে আহ্বান করেছেন, নৈতিক চেতনাই তার প্রেরণা। প্রতি কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে বিচ্ছিন্ন ও অন্যনিরপেক্ষ নীতির চেতনাই ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন ব্যক্তিগত এবং সমাজগত একটি সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—এমন করে রামমোহনের জীবনকে ব্যাখ্যা করা না গেলেও এটা ঠিক যে মধ্যযুগের বিকৃতি থেকে সত্যকে ঐক্যবোধরূপে রামমোহনই পুনর্জীবিত করলেন এবং সেটা যুগান্তর ঘটাল আমাদের সমাজে।

কারণ, দেখতে পাচ্ছি ডিরোজিওর ছাত্ররা রামমোহনের এই নৈতিক আদর্শকেই মেনে নিয়েছেন। রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব নব্যবঙ্গের নেতৃত্ব করেছিলেন। রামমোহনের সংস্কারকর্মে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন, রামমোহনের স্মৃতিবার্ষিকী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। নব্যবঙ্গেরা নিজেদের কোনো দার্শনিক মতবাদকে সৃষ্টি করে তুলতে পারেন নি, যদিও বিদেশী শাস্ত্রের চর্চা করে প্রখর বিচারবুদ্ধিকে আয়ত্ত করেছেন; সভা স্থাপন করে, পত্রিকা চালিয়ে, সমাজ ও ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা খুবই বেশি হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাঙালীকে নীতিশিক্ষা দেবার মহৎ ব্রতই নিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্ম মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই নীতিশিক্ষার উপর সব সময়েই জোর দিয়েছেন। ডিরোজিও ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেন নি, জাগিয়েছিলেন অপরিসীম নীতিনিষ্ঠা এবং বিচারশক্তি। তখন এমন কথাও শোনা যেত হিন্দু কলেজের ছাত্র মিথ্যা বলতে জানে না—Indeed the College boy was a synonym for truth. কথাটা গৌরব করবার মত, যদিও অভিভাবকেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নিজের সমাজধর্মের প্রতি নীতিপালনের অনিচ্ছা দেখে। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্তরা চিরাচরিত সমাজনীতিকে মানতে পারে নি। তাদের বিচারশক্তিকে তারা প্রয়োগ করল নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং তাই দিয়ে তারা স্থির করে নিল সত্যের নূতন স্বরূপকে। রামমোহনের সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই যে, নব্যবঙ্গের যুক্তিতর্কের ভাষা ও প্রণালী বিদেশীয়; স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও অগভীর। কিন্তু সমাজের আনুষ্ঠানিকতায় যে নীতিবোধের মৃত্যুকে তারা দেখেছিল, সেই নীতিকে অন্যভাবে তারা চেয়েছিল ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তাদের কাছে ভগবান নয়, লোকব্যবহারের সততাই হচ্ছে চরম সত্য। এর মধ্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শ হয়তো ছিল, তার সঙ্গে ছিল বিদেশী বিদ্যায় দীক্ষা। তাই দিয়ে তারা স্থির করেছে নৈতিক সত্যকে। স্বাধীন

বিচারবোধ সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য কিন্তু এর কোনো সর্বস্বীকৃত নিরিখ নেই, এটাই এর ত্রুটি। সুতরাং নৈতিক সত্য থাকল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে এই নৈতিক আদর্শ পুরোপুরিই পেয়েছিলেন। তিনি অধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠলেন, বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসও করেছিলেন, কিন্তু পরে মতের পরিবর্তনও হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত সত্যধর্মকে অবলম্বন করে শাস্ত্রবচন বাছাই করলেন অর্থাৎ ব্যক্তিতান্ত্রিক জ্ঞানদীপ্ত বিচারবোধই বড় হল। স্মরণীয় এই যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবেই তাঁর মত তিনি পরিবর্তন করেছিলেন। নব্যবঙ্গের নীতিবাদিতার সঙ্গে যুক্ত হল ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। দেবেন্দ্রনাথের পর কেশবচন্দ্রের আদর্শও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সত্যবোধের দ্বারাই তৈরি হয়েছিল। শেষ পরিণাম হল মরমিয়াবাদ।

মধ্যযুগের বাঙালী সত্যকে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও হৃদয়হীন সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও বিকৃত করে এনেছিল। সতীদাহ যারা পালন ও সমর্থন করেছে, তারাও সত্যপালনের আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কৌলীন্য এবং বহু বিবাহের স্মার্ত নির্দেশকে মহানন্দে শিরোধার্য করেও তারা ভাবল, ধর্ম পালন করল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে সত্যধারণার পরিবর্তন ঘটতে চলল। সত্য হল মানবনৈতিক। অর্থাৎ সত্য দেখা দিল শাস্ত্র-পুঁথির বাইরে ব্যবহারের জগতে। সমাজ সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদয় হয়েছে। বিদেশী সাহিত্য ধর্ম ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানুষের আচরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে এই সমাজের ধারণা গড়ে উঠেছে। এই জগতে সত্যপালনের কোনো লিখিত শাস্ত্র নেই। পুরনো সংহিতা এবং স্মৃতি থেকে আর বিধান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বভাবতই প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিরই বিচারবোধ। বাংলার নতুন যুগের লব্ধ সম্পদগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অন্যতম।

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার। পুরনো সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ইংরেজি শিক্ষা যারা পায় নি (এবং যারা পেয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে) এখনো পুরনো বিধানকে মেনে চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বলি আর নতুন মূল্যবোধই বলি— এর উদ্ভব এবং প্রতিপত্তি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। বঙ্কিম যা লিখেছিলেন, তা শিক্ষিত সমাজের জন্যই। ইংরেজি বিদ্যা এবং শাস্ত্র থেকেই তিনি প্রামাণ্যতা সংগ্রহ করেছেন, ধর্মতত্ত্বের মূল থিয়োরি তৈরি হয়েছিল ইংরেজি দর্শনের প্রভাবে। বঙ্কিম নিশ্চয়ই আশা করেন নি তাঁর রচনা সাধারণ লোকেরা বুঝবে। নব্যবঙ্গেরাও কি সেই আশা করেছিল? এই শিক্ষিত সমাজ স্বাধীন বিচারবোধে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। বঙ্কিম এই বিচারবোধকে শ্রদ্ধা ও লালন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম যখন বলেছিলেন, লোকহিতৈষার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে মিথ্যা কখনো কখনো সত্য হয়, তখন কি তিনি শিক্ষিত মনের বিচারবোধের উপরেই ভরসা রাখেন নি? এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে একটা অনড় নীতিকে পালন করার অর্থ সেই অভ্যাসেরই বশ্যতা স্বীকার করা যে অভ্যাসের বুদ্ধিহীন বিচারহীন হৃদয়হীনতাকেই আধুনিক শিক্ষা ধিক্কার দিয়েছে। বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্য কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা হয় না। এ সত্য কোন্ সত্য? এও যেন কোনো স্মার্ত সত্য। বঙ্কিম এই অচল সত্যকে অনুগমন করার পরিবর্তে চেয়েছিলেন বিচারবুদ্ধি দিয়ে সত্যকে বারবার নির্ধারণ করে নিতে।

প্রশ্ন হতে পারে মিথ্যাকে যদি এমনি করে সত্য করে তুলতে হয়, তবে কি তার মধ্যে অপব্যবহারের মস্ত ফাঁক থেকে যায় না? বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার মধ্যে সেই আশঙ্কা চিরকালই নিহিত। অশিক্ষিত মন অনেক সময়েই স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থসাধনে পরিণত করতে পারে। এই জন্যই খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধের

নীতি। এইজন্যই যত অনুশাসন এবং বিধি। এক সময়ে অবস্থাবৈগুণ্যে এই বিধিও অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন তাকে মেনে চলাই হয় দুর্ভোগ। এ রকম অচল বিধির চেয়ে চিত্তের বিচারবোধকে জাগ্রত রাখার আবশ্যকতাই বেশি। অর্থাৎ চাই একটি মার্জিত সভ্য জাগ্রত মন যে-মন ন্যায় এবং অন্যায়, উচিত এবং অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম মনের সেই অনুশীলনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্মতত্ত্বের (নবজীবনে ধারাবাহিক প্রকাশ ১২৯১-৯২) আলোচনার সূত্রপাতেই প্রচারের প্রথম সংখ্যাতে (১২৯১) 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সরলা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এ তথ্য মূল্যবান্।[৬]

তা হলে সত্যকে নির্ণয় করা চলে একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই। অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা হচ্ছে না যদিও সেই সত্য তপস্যার দ্বারাই লভ্য। যে-সত্যকে নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংশয়-বিচার-বিতর্ক উনবিংশ শতকে হয়েছে তা হচ্ছে তার লোকব্যবহারে প্রযোজ্যতা। আমাদের আলোচ্যও তাই। বঙ্কিম বলেছিলেন সত্যের নৈতিক রূপ আছে এবং সেই রূপকে স্থির করতে হয় শিক্ষা দিয়ে। এই শিক্ষা যে কি বঙ্কিম তা বুঝিয়েছেন ধর্মতত্ত্বে। 'ধর্মতত্ত্ব' বইটা মূলত শিক্ষাবিধির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেই রচিত। অনুশীলনতত্ত্ব শিক্ষারই তত্ত্ব। বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের দ্বারাই আদর্শ মনুষ্যত্ব গড়া সম্ভব। বঙ্কিম স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষার দ্বারা বিবেকবান্ কর্মনিষ্ঠ মানুষকে গড়ে তুলবার।

বঙ্কিম ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকের কাছেই এই বাণী পরিবেশন করেছিলেন। ধর্মতত্ত্বের জটিল যুক্তি এবং প্রমাণ কি অগণ্য সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারত?[৭] বলা বাহুল্য, শুধু নিরক্ষর পাঠকের কথা নয়। মোটামুটি লেখাপড়া জানা মানুষের অন্তরকেই তো জাগানো দরকার। শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ বা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মত জনসমাজে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রোতার কাছে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত নয়, গ্রহণক্ষমতা পরিণত নয়, তারা বঙ্কিমের বক্তব্য কতখানি বুঝতে পারবে সন্দেহ। আবার মাত্র বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্মতত্ত্ব রচিত হয় নি। বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়েই তিনি শিক্ষাকে দূরবিস্তৃত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে দেশের বিস্তীর্ণ অবশিষ্ট সমাজের যে প্রভেদ জন্মে গিয়েছিল বঙ্কিম তার জন্য শঙ্কিত হয়েছিলেন—[৮]

"সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

---

৬ সরলাদেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা' ১৮৭৯ শক, পৃ ৩৫।

৭ "এই অনুশীলন ধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে।" ধর্মতত্ত্ব, ২১ অধ্যায়।

৮ 'বঙ্গদর্শন' পত্রসূচনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পনা ছিল শিক্ষাকে পরিস্রুত করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বঙ্কিম এই শিক্ষাকল্পনাকে পরিহাস করে বলেছেন—

"বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ প্রভেদ থাকে যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?"

'সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে' বঙ্কিম এই বিশ্বাসটিকে দৃঢ়ভাবেই ধরেছিলেন নিশ্চয়, তা না হলে এই দুরূহ আলোচনার অবতারণা করতেন না, 'পপুলার' বা লোকপ্রিয় আলোচনাই করতেন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই যে এইসব আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, এ বিশ্বাসও তিনি শেষজীবন পর্যন্ত অটুট রেখেছিলেন। রাজশাহীতে ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' পড়লে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঠি লিখেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল দুটি: প্রথমত বাংলা ভাষা শিক্ষা, দ্বিতীয়ত শিক্ষণীয় বিষয়কে জীবনের অঙ্গীভূত করে কাজে পরিণত করা। 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন[৯]—

"এ বিষয়ে আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাদা আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে নি। বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে মনুষ্যত্ব অর্জনের কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"তাহাদের গ্রন্থজগৎ একপ্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে লালন করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না।"

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শিক্ষার হেরফের'। বঙ্কিম অবশ্য হিন্দুধর্মের সু এবং কু সংস্কারগুলি বাছাই করার ক্ষমতা অর্জনের কথা একাধিকবার বলেছেন। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্যই ছিল শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। পরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় সব আলোচনাতেই তিনি সামাজিক জড়তা ও আচারপরায়ণতার বদলে মুক্তবুদ্ধি মানব ঐক্যের শিক্ষাকেই যথার্থ শিক্ষা বলেছেন। 'কালান্তরে' 'সমস্যা' এবং 'সমাধান' নামে প্রবন্ধ দুটিতে এই কথাই প্রভূততম জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—

"অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা, তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না।"

---

৯ রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ৬১৬।

বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ যেমন বঙ্কিমের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও লক্ষ্য ছিল তাই। বঙ্কিমের কাছে বুদ্ধির চর্চা ছিল সমাজস্থিতি এবং লোককল্যাণের জন্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য। দুজনেরই কাম্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ হলেও বঙ্কিম-কল্পিত ব্যক্তিত্ব সংযমিত (controlled) কারণ সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনো সীমা নেই, কারণ বুদ্ধির সীমাহীনতা কখনোই অবাঞ্ছনীয় নয়। দুজনের মধ্যে তুলনা করবার প্রধান অসুবিধা এই যে রবীন্দ্রনাথ যেমন এ বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি প্রয়োগগত আলোচনা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় বঙ্কিমের তত্ত্ব যথাযথ পুনরাবৃত্ত হয়েছে বলা না গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্কিমের শিক্ষাপ্রকৃতির কিছু মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে তখন দেশ ও সমাজের একটা সম্পূর্ণায়ত বাস্তব চেহারা ছিল। স্বদেশী সমাজ, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি আদর্শ সামনে থাকাতে শিক্ষাকে একটা ছাঁচে ঢেলে ব্যক্তিত্বের সংযত বিকাশ ঘটাবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। এর জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট পন্থাও তাঁর কল্পনায় ছিল, যেমন— ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, প্রকৃতির সাহচর্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে সেকালে তিনি বলেছিলেন কল— তাতে সমান মাপের মানুষ তৈরি হয় মাত্র। প্রকৃতির সাহচর্যের কল্পনা তাঁর মনকে রঞ্জিত করেছিল। মনকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পেতে দিতে হবে[১০]—

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে এমনতরো মানুষ তৈয়ারি করিবার প্রণালী এক আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।"

এইজন্য শুধু বই পড়ার শিক্ষাকে তিনি মনে করেছেন ক্ষতিকর। জীবনের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারই উপর শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলা দরকার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা প্রকৃতির শিক্ষার চিন্তা এমন করে বঙ্কিম করেন নি। এজন্য বঙ্কিমের শিক্ষাপদ্ধতি পুথিঘেঁষা তাতে মননবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেই চেষ্টা নিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুভূতিকে (feeling) ধারালো করবার দিকে বেশি জোর পড়েছিল।

পরের যুগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে মূল মতের খুব বেশি পরিবর্তন না করলেও পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির উপর মোহ কমে এসেছিল; তাঁর উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল চিন্তার স্বাধীনতার উন্মেষের দিকে। এককালে শিক্ষার মধ্যে স্বাদেশিক মনোভাবের যে প্রাধান্য তিনি দিয়েছিলেন পরে তাও হ্রাস পেয়েছিল। বিদ্যার যেমন গণ্ডী নেই, চিন্তার রাজ্যের ব্যাপকতারও তেমনি গণ্ডী নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত মত অবশ্য উল্লেখযোগ্য। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতে চায় না।"

---

১০ রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ২৯৭, 'শিক্ষাসংস্কার'।

এই মতটি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা আধুনিকতর পদ্ধতিতে পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু যে সময় তিনি এ কথা বলেছিলেন তখন দেশে গান্ধীজির আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের মুখর উন্মাদনা (১৯২১)। বিশ্ব থেকে সংকুচিত করে বাঙালী বা ভারতবাসীকে স্বাজাত্যবোধের অন্ধতায় বন্দী করবার উদ্যমের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বমনস্কতার সঙ্গে শিক্ষার বিশ্বতোমুখিনতাও সম্পর্কিত। তবু, আধুনিক বাংলার প্রবণতাকে যাঁরা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে এসেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার কথা রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ পর্যন্ত কে না বলেছেন? বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পরে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যে ভাবের মিলনের ইতিহাস দিয়েছেন। পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের মিলনের কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন রামমোহন, রাণাডে, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ পরে যেসব প্রসঙ্গে পূর্বে পশ্চিমে সহযোগিতার উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট'। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করব না, এমন প্রস্তাব সর্বনাশকর। উনবিংশ শতাব্দীর এই মূল ভাবনা বিংশ শতাব্দী পুরোপুরি গ্রহণ করে বিকাশ ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শতাব্দীর উত্তরসূরী।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে গ্রহণ ও স্বীকরণের মধ্য দিয়েই আধুনিকতার সর্বময় প্রসার শুরু হয়েছে। বঙ্কিম কি তার বিরোধিতা করেছিলেন? বঙ্কিমের নবমানবতার কল্পনা ও যুক্তিবাদিতা— এসবের মূলে পাশ্চাত্য বিদ্যার পূর্ণ প্রভাব তো ছিলই শিক্ষার নির্দিষ্ট বিষয়গুলিও পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সে দেশের Physics, Chemistry, Astronomy। তাঁর কল্পিত মনুষ্যত্ব এসব জ্ঞানকে আয়ত্ত না করে তৈরি হতে পারে না। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার এক দানবী মূর্তি এঁকেছিলেন এবং তার বিষশ্বাস যেন আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন না করে সেই সতর্কতাও তিনি সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। কেউ কেউ একে বঙ্কিমের পাশ্চাত্যবিমুখতা এবং অন্ধ জাতীয়তার দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। এ রকম মত যে একেবারেই ভ্রান্ত তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথও অন্ধ স্বাজাত্যবোধকে যে বইতে সমালোচনা করেছেন সেই 'মুক্তধারা' নাটকেই যন্ত্র-সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। 'শিক্ষার মিলনে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি। আর ওরাই কি এক ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে?"

বলাই বাহুল্য এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটা দিক মাত্র। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শিল্পযন্ত্র কলকারখানাকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত বর্জনীয় মনে করেন নি তবে যন্ত্রশিল্প যদি মানুষকে অর্থগৃধ্নু ও শক্তিমদমত্ত স্বার্থান্ধ করে তোলে, তবে যে মানব-ঐক্যের উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যধারণাকে স্থাপিত করেছিলেন সেই ঐক্যই বিধ্বস্ত হবে। এ সম্পর্কে হয়তো আরও অনেক আলোচনার অবকাশ

আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার দরকার নেই। এটুকুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতোই মনুষ্যত্বের সার্থকতার চিন্তাই করেছিলেন। যন্ত্র-সভ্যতার নীতিহীন বিকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিরোধী।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে 'ধর্মতত্ত্ব' রচনায় নিরত, সেই যুগেই তাঁর মনে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ধর্মতত্ত্বে (রচনা ১৮৮৪) দেশপ্রেম ঈশ্বরভক্তির নীচেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। 'আনন্দমঠ' ১৮৮০র কাছাকাছি সময়ে রচিত। জাতীয়তাবাদের পর্যালোচনা এবং ধর্মালোচনা একই সঙ্গে ঘটতে থাকায় এমন অনুমান করাই স্বাভাবিক যে মানবধর্ম থেকে দেশপ্রীতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ধর্মতত্ত্ব বইটা থেকেই অবশ্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়া যায়। তবু উল্লেখ করছি এই কারণে যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের একটা বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করলেন যাকে অধ্যাত্মসাধনার বহির্ভূত করা চলল না। দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হল এক গভীর পুণ্যবোধ। যারা দীর্ঘকাল সামাজিক আচার পালনকেই জীবনের চরম কর্তব্য বলে ভেবে এসেছে তাদের কাছে তিনি এক নতুন অনুষ্ঠেয় কর্মের বাণী শোনালেন। একদিকে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, আর-একদিকে দেশপ্রীতির ধর্ম এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন না হলেও 'আনন্দমঠ' বইখানি এ বিষয়ে খানিকটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছে, এ কথাও সত্য। ইংরেজ-রাজত্বকে স্বীকার করার কথা বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্যান্য জায়গায় থাকলেও আনন্দমঠের উপসংহারে যে ভাবে কথাটা এসেছে সেটা আকস্মিক বলেই মনে হয়। উপন্যাস-শিল্পের এই ক্রটির কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মাতৃমূর্তি সাধনায় যে-আবেগ সৃষ্টি করলেন তা সত্যই অভূতপূর্ব। দুটি সমালোচনা এর সম্পর্কে ওঠে। প্রথমত এই দেশপ্রেম সাম্প্রদায়িক রূপকল্পনাকে প্রতীক করায় সর্বজনীন আবেগ তাতে প্রকাশ পেতে পারল না, দ্বিতীয়ত এই দেশপ্রেম অতীত ঐতিহ্য নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে সম্মুখের আকর্ষণ সমাজের কাছে তত প্রবল হয়ে উঠতে পারল না।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের কতকগুলি আদর্শ যে গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। ব্যক্তির বিচারবোধ উন্মেষের জন্য শিক্ষা, মানবিকতার ধর্ম, ইংরেজের সহযোগিতা— এ সবই রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বড় আদর্শ ছিল এই দেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথও এই দেশপ্রেমকে সমাজকে জাগাবার একটা উপায় বলে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন চিন্তাক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন দেশপ্রেমের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা বললেও রাজনীতির জনয়িতা বলতে রাজী নই। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বুদ্ধির উদ্ভব ও বিকাশ অন্যভাবে হয়েছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জমিদার-সভার মধ্য দিয়ে অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারাই এ দেশীয় রাজনীতির সূচনা হয়েছে। দেশপ্রেম এবং রাজনীতি আলাদা বস্তু, যদিও দেশপ্রেম রাজনীতিকে আশ্রয় করেই শাসনতান্ত্রিক অধিকারকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে। বঙ্কিমের দেশপ্রেমে অন্ধতা একেবারেই ছিল না। যিনি ইংরেজের সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন "ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।" তাঁর দেশপ্রেম যে অন্ধ ছিল না এ কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দেশপ্রীতি

এবং সার্বলৌকিক প্রীতির মিলনের কথা তিনি বার বারই বলেছেন।[১১] রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে এবং নানা রচনায় পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আবেগ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন এবং সেকালের সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরে একটা পথ খুঁজে নিয়েছিল। তাতে ছিল মারাঠা নেতা বালগঙ্গাধর টিলকের গভীর প্রেরণা। বঙ্কিম দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের আবেগ। সেটা যে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান্ করল ঠিক এই পথটিতে বঙ্কিমের সম্মতি থাকত কিনা সন্দেহ, অন্তত আনন্দমঠের উপসংহার থেকে এই সন্দেহ জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেশপ্রেমকে রাজনৈতিক গর্ত থেকে উদ্ধার করবারই চেষ্টা করেছেন। সেই বঙ্কিম-সৃষ্ট দেশানুরাগ তিনি জাতিকে সংহত করবার কাজেই লাগাবার আয়োজন করেছিলেন। এই স্বপ্ন বঙ্কিমের। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন—

"বাঙালী মহারাষ্ট্রী তৈলঙ্গী পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের সময় পাদটীকায় বঙ্কিমের মন্তব্য ছিল "এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।" কংগ্রেসে তখন ইংরেজি ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা চলত। বিদেশী ভাষার দ্বারা কার্যপরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ পরে প্রবল আপত্তি করেছিলেন এবং তাঁর যুক্তিও প্রবল ছিল। কিন্তু বঙ্কিমের দেশানুরাগ যে একটা সংহতির কল্পনা করেছে, সেটাই লক্ষণীয়। তিনি কংগ্রেসের এই উদ্যম দেখে গেলেন মাত্র। তার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দেখা দিল জাতিগত সংহতি সৃষ্টির স্পষ্টতর প্রয়াস।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমে কেন যে নিবিড় অতীত-ধ্যান বল দিয়েছিল তার রহস্য অনেকেই বুঝেছেন বলে মনে করেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যেসব ভারতবাসী রাজত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছিল এবং পরের যুগে যারা ইংরেজি জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছিল, তাদের সকলের মধ্যেই একটা মূল জিনিসের অভাব ছিল, তার নাম আত্মমর্যাদাবোধ। একদিকে উন্নততর সাহিত্য ও জ্ঞানসাধনা আর-এক দিকে উন্নততর নৈতিক বুদ্ধি— এ দুয়ের সম্মুখীন হয়ে স্বভাবতই নিজেদের সম্পর্কে গর্ব করবার বা মর্যাদা বোধ করবার মত বস্তু সমসাময়িক বা নিকট-অতীতে কিছুই পাওয়া যায় নি। সে জন্যই একা বঙ্কিম নন, সেকালের সবাই প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকেই বিশেষ করে চোখ ফিরিয়েছিলেন। জাতিকে আত্মসচেতন করতে হলে এ ছাড়া আর কীই বা করবার ছিল? রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ ধর্মের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এসবের মূলেও প্রচ্ছন্ন ছিল দেশানুরাগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এগিয়ে এলেন, তখন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে যতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়ে আমাদের আধুনিক সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই তাতে ভাঁটা পড়তে শুরু হল। একটা কারণ তো খুবই আধিভৌতিক। যতটা আশা করা গিয়েছিল, শাসনকার্যে ইংরেজ বাঙালীকে ততখানি বিশ্বাস করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও

১১ ধর্মতত্ত্ব ২৫ অধ্যায়।

ভারতবাসী' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ইলবার্ট বিলও মোহভঙ্গ করতে সহায়তা করেছিল। তার সঙ্গে আরও কারণ অবশ্যই ছিল।

ইংরেজ চরিত্রের পরিচয় যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল, তাতে আর অতটা হীনতাবোধের প্রয়োজন হল না। দেশপ্রেম থাকল, অতীত-গর্বও হয়তো থাকল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর-একটা দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ইংরেজের কাছে চাকরির প্রত্যাশায় বা ভালো ইংরেজি বলার বাহবার লোভে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকসমাজের বাইরে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। অনেক দিন পরে নিজের রাজনৈতিক মতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১২]—

"সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি।· ·তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই রাষ্ট্রসম্মিলনীতে গ্রাম্যজনমণ্ডলী সভাতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারিতেন না।"

কারণ এ পর্যন্ত ইংরেজি জানা শ্রোতাই ছিল সকলের বক্তৃতা ও ভাষণের লক্ষ্য। দেশপ্রেমের বর্ষণ চলত শুধু শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র সরোবরটিতে। আর সমস্ত দেশ থাকত রসহীন নিরুদ্যম শতাব্দীর সংকীর্ণ বুদ্ধিতে মোহগ্রস্ত। কংগ্রেস যদিও বিভিন্ন প্রদেশের যোগ রচনার ভার নিয়েছিল, তবু সেও ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ। দেশের অন্তঃস্থলে ঐক্যের যোগকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এসব উদ্যম দেশানুরাগমূলক বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নয়। আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক সমাজের মধ্যে যে অনৈক্য, আচারের যে শতধা বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সমস্ত দেশকে একচিত্ত করে তুলবার পথে বাধা সৃষ্টি করে আছে, রবীন্দ্রনাথ বারবার তাকে দূর করবার কথা বলতে লাগলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও তিনি এ কথা বলতে বিরত হন নি। ইংরেজকে দোষারোপ করবার আগে নিজেদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধকে জাগাবার এবং সামাজিক বিভেদ দূর করে ঐক্য সৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বারবার বলে গেলেন। সেকালে জোর পড়েছিল বাঙালী সমাজের ভূমিকার উপর, পরের যুগে জোর পড়েছিল ভারতীয় এবং বিশ্বসমাজের ভূমিকায়। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যেটুকু মতভেদ ঘটেছিল, তা ঠিক এই নিয়েই। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-যুগ এবং তাঁর যুগের তুলনা করতে গিয়ে ভাবের বিচিত্রগামিতার উল্লেখ করেছিলেন। বাঙালী-চিত্ত যে এখন নিছক তত্ত্ব এবং চিন্তাচর্চা ছেড়ে সাধারণ লোকজীবনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সেই ইঙ্গিত আছে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়।

"এখন বঙ্গসাহিত্য অতি দূরবিস্তৃত। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানাশক্তির দ্বারা নানাপথে আকৃষ্ট হইতেছেন।"

---

১২ কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'

ইংরেজ-চরিত্রের সম্বন্ধে মোহ কেটে গেলে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন নিজেদের মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবার জন্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই মোহভঙ্গের ফলে ইংরেজ-চরিত্রেই যে অবিশ্বাস এসেছিল তা নয়। ইংরেজ জাতির চারিত্র্যশক্তি বরাবরই শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল। অশ্রদ্ধেয় হল স্থানীয় শাসকশ্রেণী। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ছোট ইংরেজ আর বড় ইংরেজ— এই পার্থক্য টানলেন। এক সময়ে সব ইংরেজই আমাদের চোখে ছিল বড় ইংরেজ। বঙ্কিমের সময় থেকেই সন্দেহের যে সূচনা হয়, 'রাজা ও প্রজা'র প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করে তুললেন। সমগ্রভাবে মূল ইংরেজ চরিত্রে আস্থা রেখে ভারতবর্ষাগত ইংরেজদের সঙ্গে শুরু হল দাবি-দাওয়া আর প্রতিবাদের যুদ্ধ। এরা নিজের থেকে আমাদের অভাবের শূন্য পাত্র পূর্ণ করে দেবে, এ বিশ্বাস যখন শিথিল হল তখনই প্রশ্ন এল ঘর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের সামলানোর। হিন্দুমুসলমানের বিরোধমূলক কোনো ঘটনার পর, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পর, দেশীয় ব্যক্তির উপর ইংরেজ রাজকর্মচারীর অত্যাচারের কোনো উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই একই পরামর্শ ছিল: নিজেদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অবসান করে এক হয়ে দাঁড়াতে হবেই। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গেল নিম্নতন লোকসমাজের কাছে বিভেদ যেখানে রাজনৈতিক মতবাদের নয়, চিরাগত সামাজিক আচার এবং অভ্যাসের। লোকসমাজের কাছে শিক্ষিত সমাজের বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় বঙ্কিমচন্দ্রও চিন্তা করেছিলেন। স্বদেশী সমাজের যুগে যাত্রাকথকতা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে তার কল্পনা প্রথম দেখা দিয়েছিল।[১৩]

সমাজচিন্তার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি স্পষ্ট করেই বলা যাক। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীতে জাগরণের ক্ষেত্রটি ছিল কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ। বঙ্কিম ইংরেজ-সান্নিধ্যের ফল আত্মস্থ করে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মমর্যাদাবান্ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার কল্পনা করেছিলেন। বঙ্কিমের আলোচনা তত্ত্বাশ্রয়ী। মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করবার জন্য অতীতের কীর্তি ও কর্মশক্তির দিকেই তাকিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সময় অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পল্লীসমাজ এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী-জীবনের দিকেই দৃষ্টি ফেরালেন। তত্ত্ব বা শাস্ত্রাশ্রয়ী আলোচনা না করে সহজ মানবতাবোধের নামে সামাজিক অনৈক্য এবং অযৌক্তিক সংস্কার দূর করবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। লোকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎসাহের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে অবশ্যই লোকসাহিত্য সংগ্রহের উল্লেখ কর্তব্য। বঙ্কিম সামাজিক সংস্কারের আলাদা আলাদা প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কারকর্মকে আলাদাভাবেই অবশ্যকর্তব্য করে তুলেছেন। 'সমাজ' নামে বইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়। এই ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কারক রামমোহন বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী, যদিও পূর্বগামীদের সঙ্গে লোকজীবন এবং লোকসংস্কৃতির এতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বঙ্কিম একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকে অনুভব করাতে চেয়েছেন; রবীন্দ্রনাথ কোনো পূর্ণাঙ্গ সর্বব্যাপী পরিশোধিত জীবনতত্ত্বের থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা করার চেয়ে সোজাসুজি সংস্কার-কার্যে হাত দেবার উৎসাহ দিয়েছেন। এর পিছনে নৈতিক বুদ্ধি থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ বেশি আস্থা রেখেছেন commonsense বা সহজ

১৩ বঙ্গদর্শন ১২৮৫ অগ্রহায়ণ।

বুদ্ধির উপর। বুদ্ধি বা যুক্তির তীক্ষ্ণতা দিয়ে অনেক সহজকে জটিল করে তোলা যায়। বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রেরণা কোথায় ছিল সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অর্থপূর্ণ উক্তি করেছিলেন—

"বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায় কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ কিন্তু সবল নহে।"

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা এবং তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রভূত প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্রকে বলেছিলেন অবাস্তব 'মূর্তিমান থিয়োরি'। এই সূত্র অবলম্বন করেই দুজনের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ। চিন্তাকে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্র পুথি পাণ্ডিত্যের হাতধরা না করে রুক্ষ অভিজ্ঞতার পথে চলতে শেখালেন। জীবনযাপনের আদর্শ আর মনুর বিধানে পাওয়া যাবে না, কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারস্থ হওয়া অনাবশ্যক। মানবসম্পর্কের সহজ সত্যকে পেতে যুক্তি যতই অমোঘ হোক, সে কেবল নির্বস্তুকতার ধূমজালই সৃষ্টি করে। সত্যকে পাওয়ার উপায় জীবনের বাস্তবকে সহজ অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে দেখা। 'ডাকঘর'এর অমল পণ্ডিত হতে চায় নি, সে চেয়েছে রসিক হতে— জীবনের স্পর্শকে ইন্দ্রিয় দিয়ে লুটে নিতে। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি'। সত্যকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয় জীবন দিয়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্কের সত্য-ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। বঙ্কিমের মতে সত্য পরিবর্তনশীল, পরে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করেছেন। বঙ্কিম যুক্তি সংগ্রহ করেছেন গ্রন্থজগৎ থেকে যদিও যেটা প্রমাণ করতে যাচ্ছেন সেটা তাঁর জীবনের উপলব্ধি। মনীষার বিচারে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিকে পূর্বনির্ধারিত বিধানের বশ্যতা থেকে মুক্তি দিয়ে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। শুধু স্মৃতির বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিধান নয়, স্বাজাত্যবোধ এবং কর্মের অন্ধ আচার থেকেও। বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয় এমন কোনো আচরণকেই তিনি স্বীকার করতে সম্মত হলেন না— তার তত্ত্ব যা-ই থাকুক-না কেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চরকা-খদ্দরের দ্বারা অর্থনৈতিক বয়কটের তত্ত্বকেও তিনি মানতে পারলেন না। অত্যন্ত ঋজু কণ্ঠে বলেছেন[১৪]—

"সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই জন্যেই যেসব কাজ মুখ্যত কোনো একটা শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে।"

বুদ্ধির সামান্যতম ব্যাঘাতের ত্রাসে শেষের দিকে তাঁর এক আশ্চর্য স্পর্শকাতরতা এসেছিল। কর্মবাদী প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে হয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধিবাদী ইনটেলেকচুয়াল। নির্বাধ বুদ্ধির অগ্রসরণের শেষ পরিণাম যে কি হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা ছিল না।

মনীষী বঙ্কিম এবং মনীষী রবীন্দ্রনাথের তুলনায় যে কথাগুলি উপরে বলেছি তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাঠকরা পাবেন বঙ্কিমের 'সাম্যে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লে কিংবা বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের

---

১৪ কালান্তর, 'চরকা'।

কৃষক'এর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা পড়লে। কৃষকদের দুর্দশা নিবারণের শেষ ভরসা বঙ্কিম মানুষের শুভবুদ্ধির উপরেই রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথও মহাজন জমিদার বা বর্তমান কোনো শ্রেণীতে নিঃসংশয়িত হতে না পেরে সেই শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু দুজনের আলোচনাপদ্ধতি একেবারে পৃথক। একজন অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গে নানা সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি মিলিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, অন্যজন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের থেকে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বঙ্গদেশের কৃষকে' বঙ্কিম নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার রাজ্য ছেড়ে জীবন্ত সমস্যার চিন্তায় ব্যাপৃত, আবার স্বদেশী যুগের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিক সমাজকে মুখ্যত উপজীব্য করলেও ইতিহাস সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতির প্রসঙ্গ এনেছেন বক্তব্যকে জোরালো করতে।

তবু, বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিমিত, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিস্তৃত। এই বিস্তারে বক্তব্য বা যুক্তিরও যে বিস্তার আছে, তা নয়। মূল কথাটি খুবই সরল এবং যে হেতু সেটা একটা উপলব্ধির সত্যের মত, সে জন্যে তাতে যুক্তির যে কিছু অনিবার্যতা আছে, তা নয়। এ হচ্ছে সহজ বুদ্ধির সত্য। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় মূল বক্তব্যটিকে পাঠকের কাছে সোজাসুজি আনবার আগে রবীন্দ্রনাথ যে কথার বিস্তীর্ণ আয়োজন করেন, তা যুক্তির নয়, পাঠক-মনের আনুকূল্য লাভের উপযুক্ত পরিবেশ রচনার। পরিবেশ রচনা করতে কখনও উপমা কখনও কৌতূহলজনক কোনো ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এমনকি কখনও 'প্যারাবল্' জাতীয় কথিকা প্রভৃতিও ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাকে বিস্তারিত করতে করতে অসম্ভবতাকে বুঝিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাহুল্য শিল্পেরই শোভা, বিজ্ঞানের বাহুল্য নেই। বঙ্কিমের প্রবন্ধ যে পরিমিত বাহুল্যবর্জিত তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী (scholarly) সে তাঁরই বৈজ্ঞানিকধর্মী যুক্তিবাদিতার জন্য। বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে না, তর্কশক্তিকে শাণিত করে। এইজন্য তাঁর প্রবন্ধের কোনো অংশ চোখ এড়িয়ে গেলে যুক্তির শৃঙ্খলটিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

মনীষার বিচার হবে কি দিয়ে— যুক্তির অমোঘতা দিয়ে, না, অভিজ্ঞতার বিশ্বাস্যতা দিয়ে ?

বেকার-সমস্যা ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অমর্ত্যকুমার সেন

আজ প্রায় দশ বছর হল, সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা চলেছে। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হল ; তৃতীয় পরিকল্পনাটির খসড়া বের হয়েছে, কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাটিকে বিচার করলে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে ; সে সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই।

আগের সঙ্গে তুলনা করলে গত দশ বছরে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি নিঃসন্দেহে হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে (১৯৫১-৫৬) দেশের আয় বেড়েছে শতকরা আঠারো ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে (১৯৫৬-৬১) জাতীয় আয় শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়বে এরকম আশা করা গিয়েছিল। সে আশা মিটবে বলে মনে হয় না, তবে শতকরা বিশ ভাগ বৃদ্ধি শেষ অবধি হতে পারে, হিসেবে এইরকম পাওয়া যাচ্ছে। এই দশ বছরে দেশের জনসংখ্যাও বেশ খানিকটা বেড়েছে, তবুও জনপ্রতি আয় বেড়েছে সব মিলিয়ে শতকরা প্রায় বিশ ভাগ। জনপ্রতি আয়বৃদ্ধির এই হার রুশ, বা চীন, বা জাপান, কিম্বা উনবিংশ শতকের ইংলণ্ড-আমেরিকার তুলনায় সামান্যই, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ'কে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক বিষয়ে কিন্তু গত দশ বছরে, উন্নতি তো দূরের কথা, বেশ ভীতিজনক অবনতি ঘটেছে। বেকার-সমস্যা সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা দেয় নি ; কর্মহীনের সংখ্যা এ দেশে বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। 'ন্যাশনাল সাম্পল্ সার্ভে' থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে অন্তত দেড় কোটি লোক পূর্ণবেকার বা অর্ধবেকার। এ ছাড়া শহরে শহরে বেকারের ভিড়ের কথা তো আমরা সকলেই জানি। তার উপর জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বছর বছর কর্মসন্ধানীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছিল ; ঠিক করা হয়েছিল যে পরিকল্পনার গোড়ায় যত সংখ্যক বেকার ছিলেন, তার থেকে বেকারের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে কর্মসন্ধানীদের সংখ্যা যে হারে বাড়বে, চাকরির ব্যবস্থাও সেই হারে যাতে বাড়ে, তা দেখা হবে। এ রকম একটা প্রচেষ্টাকে বেকার-সমস্যা সমাধানের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়তো বলা যায় না, তবে এতে সাফল্যলাভ করলে অন্তত বেকারের ভিড়ের ক্রমবর্ধমান চাপটাকে আটকে রাখা যেত। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও সফল হয় নি ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ায় বেকারের সংখ্যা যা ছিল, পরিকল্পনার শেষে সেই সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ বেশি হবে মনে হয়।[১] পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই বেকারদের পল্টনে বছর বছর চার লক্ষ লোকের যোগ দেওয়া মোটেই আশ্বস্ত হবার মত ব্যাপার নয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে কর্মঠ ব্যক্তির সংখ্যা বাড়বে দেড় কোটি। তাই অন্তত দেড় কোটি নতুন চাকরির ব্যবস্থা না হলে বেকারদের সংখ্যা আরো বেড়ে চলবে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে যে,

---

১ *Third Five Year Plan, A Draft Outline* (*Planning* Commission, Govt. of India, June 1960), পৃ. ৮৪।

এই পাঁচ বছরে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে (মোট দশ হাজার দু শো কোটি টাকা) তাতে এক শো চল্লিশ লক্ষ লোকের নতুন চাকরি জুটবে। তাই অন্য কোনো ব্যবস্থা না করলে আরো দশ লক্ষ কর্মান্বেষী, সরকারী হিসেব মতেই, কর্মহীন হবে। তা ছাড়া অনেকেই এই সংশয় পোষণ করেন যে যতটা চাকরির সংস্থান হবে বলে পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হচ্ছে, ততটা হবার সম্ভাবনা সামান্য। অধ্যাপক শ্রীঅমিয় দাশগুপ্ত একটি হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন যে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা না কমিয়ে ঐ দশ হাজার দু শো কোটি টাকার পরিকল্পিত খরচ থেকে এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি চাকরির ব্যবস্থা হবে না।[২] এই হিসেব যদি ঠিক হয়, তবে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে দেশে ত্রিশ লক্ষ নতুন বেকার দেখা দেবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেমন বেকারদের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে না এমন প্রতিজ্ঞা করেও শেষ অবধি বিশ লক্ষ নতুন লোক বেকারত্ব লাভ করেছেন, তেমনি তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে ত্রিশ লক্ষ এ বেকার-সমুদ্রে যোগ দিতে পারেন। যে দেশে নানা সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রগতির প্রচেষ্টা হচ্ছে, সেই দেশে দশ বছরে নতুন আধ কোটি কর্মঠ লোকের বেকারত্ব লাভ আশ্চর্য হবার মত ঘটনা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় তৃতীয় পরিকল্পনার কলেবর নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

বেকার-সমস্যার অর্থনৈতিক দিক

বেকার-সমস্যার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে তার সামাজিক অত্যাচারের দিক। বেকার হওয়ার কি কি অসুবিধা তা নিয়ে বোধ হয় আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। বেকার-সমস্যার আর-একটি দিক হচ্ছে তার অর্থনৈতিক অপচয়ের দিক। দেশের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার না হলে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতাও কমে যায়; ফলে জাতীয় জীবনযাত্রার মান যতটা উঁচু হতে পারত ততটা হয় না।

এই দুটো দিককে একসঙ্গে দেখলে বেকার-সমস্যার কারণ নিয়ে একটু খটকা লাগে। কর্মহীনতার ফলে যাঁরা বেকার তাঁরা তো ভুগছেনই, দেশের আর দশজনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বেকারদের চাকরি হলে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়বে, যাঁরা বেকার ছিলেন তাঁরাও বেঁচে-বর্তে থাকবেন। তা হলে সমস্যাটা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক দেশে বেকার-সমস্যা সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের চাহিদার অভাব। আয় স্বল্প হলে লোকের চাহিদা কম হয়, চাহিদা কম হলে অতিরিক্ত জিনিসপত্র উৎপাদন ক'রে শিল্পপতিরা লাভ করতে পারেন না। ফলে উৎপাদন কম হয়। উৎপাদন কমে গেলে বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগ করার প্রয়োজন ঘটে না। সেই কারণে লোকের আয় কম হয়। তার ফলে আবার চাহিদা অল্প হয়ে দাঁড়ায়।— ধনতান্ত্রিক সমাজে বেকার-সমস্যা প্রায়ই এমন চক্রাকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু যেখানে সরকারই দেশের হয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেন, সরকারই ইচ্ছেমত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, সেখানে চাহিদাহীনতা সহজে জন্মাতে পারে না।

বেকার-সমস্যার আর-একটি দিক হচ্ছে এই যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় জনবলই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, তার সঙ্গে যন্ত্রপাতিরও দরকার আছে: এখন, ভারতবর্ষের মত আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত দেশে, যন্ত্রপাতি

২ Dr. A. K. Das Gupta, "Investment & Employment in Third Five Year Plan", *Yojana*, July 24, 1960, পৃষ্ঠা ১৫। পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তৈরি করে, এ ধরণের শিল্পের বিশেষ অভাব। ফলে চাহিদা বাড়লে যন্ত্রপাতির অভাব পড়ে, এবং সে অভাবের কল্যাণে শ্রমিক-নিয়োগ সম্ভব হয় না। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হলে বিদেশী মুদ্রার অভাব দেখা দেয়, ফলে সমস্যাটি অন্য রূপ নিয়ে থেকে যায়। এ অবস্থায় একটি উপায় হচ্ছে দেশের রপ্তানি বাড়ানো যাতে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিদেশী মুদ্রা জোটে। অথচ রপ্তানি বাড়ানো মোটেই সহজ নয়। দেশের ক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র বিদেশে চালান দিলে দেশের বাজারে ঐসব জিনিসের অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে দেশে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। এ ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে রপ্তানির দিক থেকে একটা বিশেষ সমস্যা হচ্ছে এই যে বিদেশে রপ্তানি করার মত জিনিস আমরা খুব একটা তৈরি করি না। আমাদের চিরাচরিত রপ্তানি মাল যেগুলি— যেমন, চা, পাটজাতদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি— সেগুলির আন্তর্জাতিক চাহিদা সহজে বাড়ানো সম্ভব নয়। নতুন রপ্তানি মাল— যেমন, বিজলী পাখা, সেলাই কল, ইত্যাদি— বিক্রির ব্যাপারেও আমাদের খুব একটা অগ্রসর হবার সুযোগ অদূর ভবিষ্যতে আছে বলে মনে হয় না, কারণ এসব জিনিসে ভারতবর্ষের জগৎজোড়া সুনাম হতে সময় লাগবে।

এইসমস্ত কারণে, যন্ত্রপাতির অভাব মেটাতে আমাদের নিজেদেরই যন্ত্রপাতি তৈরি করা প্রয়োজন। এদেশ-ওদেশের কাছে ধার করে যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা আমাদের কিছুদিন হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হলে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি তৈরির শক্তি আমাদের হওয়া দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতেও তৃতীয় পরিকল্পনাকে বিচার করা উচিত। সুখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি তৈরি করার দিকে বেশ কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব মিলে পরিকল্পনার কলেবরটি ছোট হওয়ায় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত বিষয়ে ভারতের পরনির্ভরশীলতা এই পাঁচ বছরে তেমন কমবে না। পরিকল্পনার কলেবর নিয়ে পরে আলোচনা করব, তার আগে আর দু-একটি বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন

কোনো জিনিস উৎপাদন করতে যদি আজ কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাদের তৈরি জিনিস উৎপন্ন হতে কিছু সময় লাগবে, ফলে প্রথমে কিছুদিন তাদের তৈরি জিনিস বাজারে পাওয়া যাবে না। এদিকে তারা তাদের মজুরির টাকা খরচ করে নানা জিনিস কিনবে। তাই, এই উৎপাদন-প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদন বাড়তে বেশ খানিকটা সময় নেবে, কিন্তু চাহিদা বাড়বে তখন-তখনই। ফলে, কিছুদিন বাজারে জিনিসপত্রের অভাব ঘটতে পারে, এবং তাদের অগ্নিমূল্য হবার একটা সম্ভাবনা আছে। এই সমস্যা এড়াতে হলে কোনো-না-কোনো উপায়ে উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কমানো দরকার। চাহিদা কমানোর একটি পথ হচ্ছে দেশের করবৃদ্ধি, যাতে খরচে লোকের হাতে টাকা কমে। অন্যদিকে শ্রমিকরা যেসব জিনিস প্রধানত কেনে বা কিনতে চায়, সে সমস্ত জিনিসের উৎপাদনবৃদ্ধি এই সূত্রে খুবই জরুরি। এ ধরণের দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্যশস্য। বেকার-সমস্যা কমাতে হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

তৃতীয় পরিকল্পনায় চাষবাস বাড়ানোর দিকে সরকার বেশ খানিকটা নজর দিয়েছেন। ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় সাড়ে সাত কোটি টন হবে বলে মনে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬র মধ্যে, সেটাকে বাড়িয়ে দশ বা সাড়ে দশ করার পরিকল্পনা আছে। এ

প্রচেষ্টা সফল হলে উল্লসিত হবার বেশ একটু কারণ থাকবে। এ প্রসঙ্গে কিন্তু দুটি জিনিস বলা বোধ হয় প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এ কথা মনে রাখা দরকার যে উৎপাদনবৃদ্ধির মালমসলা যোগাড় করা আর উৎপাদন-বৃদ্ধি পাওয়া এক নয়। সেচব্যবস্থার উন্নতি, কিম্বা ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক সার তৈরি হলেও তার প্রয়োগে বেশ-কিছু অসুবিধা আছে, যতদিন-না ভারতবর্ষের গ্রামগুলির সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। একদিকে ভূমিহীন চাষী, অন্যদিকে কর্মবিমুখ ভূস্বামীর ভিত্তিতে গড়া চাষ-ব্যবস্থায় জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে খুব একটা নজর আশা করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে তৈরি সেচব্যবস্থার অপচয় দেখলে এ বিষয়ে একটু আন্দাজ সহজেই পাওয়া যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে নতুন ৬৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ-সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মোটে ৩৩ লক্ষ একরে সেই সেচব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া হয়। এমন-কি ১৯৫৮-৫৯ সালেও নতুন ৯৬ লক্ষ একরের সেচ-সম্ভাবনার মধ্যে মোটে ৬৪ লক্ষ একরের ব্যবহার কার্যতঃ হয়েছিল।[৩] তা ছাড়া অনেক জায়গায় সেচের ব্যবহার হলেও, তার পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হয় নি। জমিতে বছরে দুটো ফসল তোলার চেষ্টা অল্পই হয়েছে, যদিও আমাদের সেচব্যবস্থার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তাই। পরবর্তী সময়কার সঠিক খবর এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি, তবে যতটা জানা গেছে তাতে মনে হয় যে সেচ-সম্ভাবনার বিপুল অপচয় এখনো চলেছে। গ্রামাঞ্চলের সমাজ-ব্যবস্থার (বিশেষতঃ জমি-অধিকারের) আমূল পরিবর্তন না করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় যে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর নানারকম চেষ্টার কথা লেখা আছে, সেগুলোর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এ জাতীয় সামাজিক পরিবর্তনের উপর। দুঃখের বিষয় যে, এ সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনায় খুব তেমন আলোচনা নেই।

বিনিয়োগের পরিমাণ

এ প্রশ্নটা যদি মুলতবি রাখি, এবং ধরে নিই যে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন না করেও ঐ দশ সাড়ে-দশ কোটি টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে, অর্থাৎ খাদ্যশস্য উৎপাদন শতকরা তেত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ বাড়বে, তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে সেই তুলনায় পরিকল্পনায় বেকারদের কাজে নিয়োগ ক'রে দেশের কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টাটি এত স্তিমিত হল কেন। এই পাঁচ বছরে দেশের আয় বাড়বে মোটে শতকরা পঁচিশ ভাগ, আর খাদ্যশস্য বিক্রীত হবে শতকরা তেত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ বেশি। এ চিত্রটি খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। দেশের জনসংখ্যাও অবশ্য শতকরা দশ ভাগের বেশি বাড়বে, কিন্তু বেকারদের সংখ্যা বেড়ে চললে দেশের লোকের খাদ্য কেনার সামর্থ্য হবে কি করে? ন্যাশনাল সাম্পল্ সার্ভে থেকে যে সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় না যে, আয়ের পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শস্য ভোজনের পরিমাণ তেত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি খুব একটা সম্ভাব্য ঘটনা। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিকারের অভাব আরও অর্থহীন লাগে। সত্যিই যদি দশ বা সাড়ে-দশ কোটি টন খাদ্যশস্য তৈরি করা যায়, তা হলে পরিকল্পনায় আরও কিছু বেশি অর্থ বিনিয়োগ করলেও খাদ্যের দাম বাড়ত বলে মনে হয় না।

এবারে আসা যাক সরকারী করের ব্যাপারে। বর্তমান হারে আয়কর বিক্রয়কর ইত্যাদির সাহায্যে

---

৩ *Third Five Year Plan, A Draft Outline*, পৃ. ১৭৮

তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে সরকার যত টাকা পাবেন, তার অনেকটাই যাবে সরকারী দৈনন্দিন খরচের খাতায়। পরিকল্পনায় ব্যবহার করার জন্য বাকি থাকবে পাঁচ বছরে মোট ৩৫০ কোটি টাকার মত। এ ছাড়া নতুন কর বসিয়ে বা করের হার বাড়িয়ে সরকার রোজগার করবেন আর ১,৬৫০ কোটি আন্দাজ। তাই সব মিলে দু হাজার কোটি টাকা সরকার পাবেন কর থেকে। দশ হাজার দু শো কোটি টাকার পরিকল্পনায় বাকি অংশের খানিকটা আসবে জাতীয়কৃত শিল্পগুলির লাভ থেকে; খানিকটা জনসাধারণের দেওয়া ধার থেকে, কিছু বিদেশী সাহায্য থেকে, কিছু শিল্পপতিদের জমানো বা ব্যাঙ্কের কাছে ধার নেওয়া টাকা থেকে, আর অল্প কিছু আসছে নতুন-ছাপা টাকা থেকে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে নতুন ছাপা টাকায় খরচপত্র চালাতে সরকার বেশ একটু ভয় পেয়েছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খরচের চার হাজার ছ শো কোটির মধ্যে এক হাজার এক শো পঁচাত্তর কোটি টাকা এসেছে নতুন ছাপা নোট থেকে; তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী খরচ সাত হাজার দু শো পঞ্চাশ কোটির মধ্যে মোটে পাঁচ শো পঞ্চাশ কোটি এই তহবিল থেকে নেওয়া হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তার থেকেই সরকার মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে শঙ্কিত হয়েছেন বলে মনে হয়। মুদ্রাস্ফীতির ভয়ের যে কারণ নেই তা নয়, কিন্তু দেশে যদি উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ থাকে তা হলে নতুন অনেক নোট ছাপালেও মূল্যবৃদ্ধি না ঘটতে পারে; কারণ, ঐ থেকে যে নতুন চাহিদা জন্মাবে, তার অনেকটাই, বা পুরোটাই, নতুন উৎপাদন থেকে মেটানো সম্ভব। তবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা থাকলে এসব ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ আছে বইকি। সে ক্ষেত্রে করবৃদ্ধির প্রচেষ্টা মূল্য ঠিক রাখার দিক দিয়ে খুবই প্রয়োজন।

করব্যবস্থার কয়েকটি দিক

সরকার যখন লোকের আয় বা ব্যয়ের উপর কর বসান, তখন জনসাধারণের কেনার ক্ষমতা কমে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও অল্প হয়। তাই দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি গড়ে তুলতে সরকার যদি অনেক খরচ করতে চান, তা হলে করের আশ্রয় নেওয়া নির্ভরযোগ্য, কারণ এসব কারণে লোকের মোট আয়ের যেমন উন্নতি হবে, অন্য দিকে করের ফলে খরচ করার ক্ষমতা কমবে। ব্যাপারটা শুনতে একটু ঘোরালো লাগছে, একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মনে করা যাক, শ্যাম টেনিস খেলবার জন্য নতুন দু জোড়া সাদা পাৎলুন কিনবে ভাবছে। যদু বেচারা বেকার, বাড়ির লোকের গঞ্জনা শোনে, আর ঘরে বাঁদিপোতার গামছা প'রে বসে থাকে। এখন, সরকার স্থির করলেন রাস্তা বানাবেন, সেই কাজে যদু নিযুক্ত হল। নতুন-পাওয়া রোজগারের টাকায় যদু পাৎলুন কিনতে চলল। বাজারে যদি যদুর সংখ্যা অনেক হয়, তা হলে পাৎলুনের দাম বেড়ে যাবে। কিন্তু শ্যামের আয়ের উপর কর বসালে তারা তাদের পুরনো পাৎলুনেই টেনিস খেলবে, ফলে বাজারে পাৎলুনের চাহিদা আগের মতই থাকবে। একদিকে বসল কর, অন্যদিকে যদুর জুটল চাকরি। একদিকে শ্যাম টেনিস খেলবার জন্য নতুন পাৎলুন পেল না, অন্যদিকে যদু বাঁদিপোতার গামছার কবল থেকে উদ্ধার পেল। মাঝের থেকে কিন্তু দেশের একটা রাস্তা লাভ হল। কর দিয়ে সরকারী খরচে দেশের নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করার এই দিকটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। খবরের কাগজ পড়ে আমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে সরকারী করের একমাত্র উদ্দেশ্য কিছু টাকা সংগ্রহ। কিন্তু টাকার কেয়ার

সরকার করেন না। সরকার তো নোট ছাপিয়ে যত চান তত টাকা বানিয়ে নিতে পারেন। করের উদ্দেশ্য কিছু কিছু লোকের খরচ করার ক্ষমতা কমানো। যাতে চাহিদার চাপে মূল্যবৃদ্ধি কম হয়। পরিকল্পনায় যে টাকা খরচ হবে সে টাকা কি ক'রে জুটবে সেটা বড় প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পরিকল্পিত নতুন খরচের ফলে যে বাজারে চাহিদার বৃদ্ধি হবে, সেটাকে সামলাতে আশপাশের অন্যান্য চাহিদার হার কিভাবে কমানো যায়।

এ বিষয়ে বিক্রয়করের ফলাফল নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের মহলে একটু-আধটু মতবিরোধ হয়েছে। অনেকেরই মনে হয়েছে যে বিক্রয়করের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে; যে সময়ে এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে সে সময়ে এ-কর বসালে তাকে আরো উস্কানি দেওয়া হবে। এ যুক্তিটি কিন্তু মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। পেট্রোলের উপর কর বসালে পেট্রোলের দাম বাড়তে পারে, কিন্তু পেট্রোলের দাম বাড়লে, যাঁরা পেট্রোল কেনেন তাঁদের হাতে কম টাকা থাকবে, তাই তাঁরা অন্যান্য জিনিসপত্র কম কিনতে পারবেন। সে জায়গায় যদি বিক্রয়কর না থাকত তো দুটো ফল হতে পারত। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে সে ক্ষেত্রেও পেট্রোলের দাম চাহিদার চাপে বেশ বেশিই হত। সে অবস্থায় পেট্রোলের বিক্রেতারা নতুন স্ফীত রোজগারের কল্যাণে বেশি বেশি খরচ করতেন। অন্য সম্ভাবনাটি হচ্ছে এই যে পেট্রোলের দাম কম হত। ফলে পেট্রোলের ক্রেতারা অন্যান্য জিনিসে প্রচুর খরচ করতেন। যেটিই হোক-না কেন, বিক্রয়কর না থাকলে দেশে খরচ এবং জিনিসপত্রের চাহিদা বেশি হত, ফলে তাদের দরদামও বেড়ে চলত।

ভারতীয় করব্যবস্থা

তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বসানো করের বিষয়ে দুটো প্রশ্ন সবার আগে করা দরকার। প্রথমতঃ, পরিমাণে কর কি আরও বসানো যেত? কর বেশি বসিয়ে কি পরিকল্পনার কলেবরটি এভাবে বাড়ানো যেত, যাতে বেকাররা চাকরি পেতেন? দ্বিতীয়তঃ, কর যেভাবে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে তা কি সন্তোষজনক? এ দুটি প্রশ্নের জবাবেই আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ব্রিটেন একটি ধনতান্ত্রিক দেশ; আমাদের মত সমাজতন্ত্র তাদের আদর্শ নয়। অথচ ধনীদের উপরে বসানো করের পরিমাণ আমাদের দেশে ব্রিটেনের তুলনাতে অনেক কম। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৪ সালে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে ধনী শতকরা এক ভাগ লোক ঐ দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ন' ভাগ রোজগার করেছে, আয়কর দেবার আগে। আয়করের কল্যাণে তাদের মোট আয় এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা পাঁচ ভাগে। আমাদের দেশের সবচেয়ে ধনী শতকরা এক ভাগের আয় জাতীয় আয়ের শতকরা এগারো ভাগ; আয়কর দেবার পরে তা হয়ে দাঁড়ায় শতকরা দশ ভাগ।[৪] তেমনি যদি ব্রিটেনের উপরের দিকের শতকরা পাঁচ ভাগ লোককে দেখা যায়, কর দেবার আগে তাদের মোট আয় জাতীয় আয়ের শতকরা একুশ ভাগ, করের

৪ ভারতবর্ষের তথ্যগুলি ১৯৫৫-৫৬ সংক্রান্ত। এ দুটো বছরের (এবং ১৯৪৯ এর) তুলনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে —"The Inequality of Indian Incomes", by H. F. Lydall, *The Economic Weekly*, Special Number, June, 1960, পৃ. ৮৭৩-৭৪

পর তা শতকরা পনেরো ভাগে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে ঐ উপরওয়ালা শতকরা পাঁচ ভাগের আয়, আয়কর দেবার আগে জাতীয় আয়ের শতকরা তেইশ ভাগ, কর মিটিয়ে দিয়েও শতকরা বাইশ ভাগ বজায় থাকে। এসব তথ্যের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় যে বিলেতে কর চাপিয়ে ধনীদের কাছ থেকে যতটা টাকা নেওয়া হয়, আমরা তার ধারে-কাছেও যাই না।

এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার অনেক কিছুই রয়েছে। ভারত সরকারের আদর্শ হল সমাজতন্ত্র, ব্রিটেনের তা নয়। অথচ ভারতের তুলনায় ধনীদের উপর কর ধনতান্ত্রিক দেশ ব্রিটেনে অনেক বেশি। এই প্রসঙ্গে বোধ হয় এটাও বলা উচিত যে জাতীয় স্বার্থের কথা বলে ভারতবর্ষে রেল-কর্মী প্রভৃতি সরকারী চাকুরেদের ধর্মঘট বে-আইনি ঘোষণা করা হয়; অন্যদিকে ব্রিটেনে রেলকর্মীদের ধর্মঘট দস্তুরমত আইনানুগতভাবে হতে পারে। ১৯২৫ সালে তা হয়েওছিল। দেশের অর্থনীতির উন্নতির যদি একটা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা হয়, তা হলে এ জাতীয় ধর্মঘট বে-আইনি ক'রে দেবার সপক্ষে যুক্তি হয়তো ভারি। কিন্তু এক দিকে গণতন্ত্রের আদর্শ বজায় রাখার নামে সমাজব্যবস্থার চিরাচরিত চেহারা অপরিবর্তিত রাখা, এমন-কি ধনীদের উপর অত্যাবশ্যক আয়কর অবধি না বসানো, অন্য দিকে ধর্মঘটকে বে-আইনি করা, এর মধ্যে একটা অবিচার আছে এটা মনে করা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি

এ প্রসঙ্গে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি নিয়েও আলোচনা করা দরকার। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ই মনে করেন যে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতির কল্যাণে কোনোরকম বড় পরিকল্পনা ভারতবর্ষে এখন করা সম্ভব নয়। মুদ্রা-ঘাটতি যে ভারতবর্ষের একটা খুবই বড় সমস্যা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় (পৃ ৫৩) বলা হয়েছে যে, এই পাঁচ বছরে ভারতবর্ষের উৎপাদন বজায় রাখতে যে পরিমাণ কাঁচা মাল, আধা-তৈরি মাল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক জিনিস আমদানি করতে হবে তার দাম প্রায় তিন হাজার পাঁচ শো সত্তর কোটি টাকা, এবং ভারতবর্ষের মোট রপ্তানি এই পাঁচ বছরে হবে মোট তিন হাজার চার শো পঞ্চাশ কোটি টাকা। আমাদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করলে মুদ্রাঘাটতির পরিমাণ আরও বেশি হবে। তাই বিদেশী সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশে এখন কোনোরকম যন্ত্রপাতি আমদানি সম্ভব নয়, তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় এমন বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বেশি বড় পরিকল্পনা করার সাহস আমরা পাব কোথা থেকে? এ যুক্তির মধ্যে অনেক সত্য কথা আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে তিনটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থায় নিত্যব্যবহার্য বস্তু যেমন অনেক তৈরি হয়, ধনীদের ভোগ্য দ্রব্যও কম তৈরি হয় না। অনেক বিলাসদ্রব্যের প্রস্তুতিতে বিদেশী কাঁচামাল, বা বিদেশে আধা-তৈরি জিনিস প্রচুর পরিমাণে লাগে। এ-জাতীয় উৎপাদন দেশে কমালে, আমদানির উপর চাপ হ্রাস পাবে। ধনীদের উপর কর বসালে বিলাসদ্রব্যের চাহিদাও কমবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে আধা বা পুরো তৈরি যেসব জিনিস আমাদের এখনও কিনতে হয় তার কিছু কিছু দেশে তৈরির ব্যবস্থা করলে বিদেশী মুদ্রার অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হবে। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করলে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র না বাড়িয়েও কয়েক ধরণের উৎপাদন বেশ কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। ভূমিহীন চাষী ও কর্মবিমুখ ভূস্বামীর ভিত্তিতে গড়া সমাজ-ব্যবস্থায় সেচ, এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কতটা অপচয় হয় এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এই সমাজরীতির

বদল করলে দেশের অর্থনৈতিক্ সম্ভাবনার অধিকতর ব্যবহার বিদেশী মুদ্রার সাহায্য ছাড়াই হতে পারে। এইসব কারণে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতিকে ভীরু পরিকল্পনার অজুহাত না বানিয়ে, সাহসী পরিকল্পনার কারণ হিসেবেই ধরা উচিত ছিল। এ বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনার নিশ্চেষ্টতায় ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গত পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা কমা তো দূরের কথা, বেড়েছে বিশ লক্ষ। সামনের পাঁচ বছরে তা বাড়বে অন্তত আরও দশ লক্ষ, একটি হিসেবমতে তিরিশ লক্ষ। বেকারদের সংখ্যা কমাতে হলে, অন্ততঃ আর যাতে না বাড়ে, তা দেখতে হলে, এবারকার তৃতীয় পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বড় অনেক বেশি সাহসী পরিকল্পনার দরকার। সে রকম একটি পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে, সমাজের— বিশেষত গ্রামীণ সমাজের, ভিত্বদল প্রয়োজন। করব্যবস্থা প্রমুখ অর্থনৈতিক রীতিনীতির পরিবর্তন তো অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় পরিকল্পনা সফল হোক, এটা আমরা সকলেই চাইব। কিন্তু দেশের আর্থিক দুর্গতি পুরোপুরি রোধ করার কোনোরকম সাহসী প্রচেষ্টা যে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হল না, এটা অনেকের মনেই আপশোসের সঞ্চার করবে।

ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজ

বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রামায়ণ কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা এবং বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি নিজে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে আর্যদর্শন পত্রিকায় সে-সময় বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল কাব্য প্রকাশিত হচ্ছিল এবং ঐ কাব্যের "আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি-প্রতিভার" ভাবটি তাঁর মনে আসে। বিদ্বজ্জনসভার দ্বিতীয় বাৎসরিক সম্মিলন উপলক্ষে "দস্যু রত্নাকরের কবি হইবার কাহিনী" নিয়ে একখানি নাটক লিখবার প্রস্তাব উদ্যোক্তাদের সংগত বোধ হল। তখন সারদামঙ্গলে বর্ণিত বাল্মীকি-কাহিনীর সঙ্গে "দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল"। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাদেবী সরস্বতী সেজেছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে এই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"

দেখা যাচ্ছে রত্নাকর দস্যুর কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমে মনে এসেছিল। পরে তিনি তার সঙ্গে বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ অংশকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এই কাহিনী একটি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। একটি নিরাশ্রয়া বন্দিনী বালিকার (ছদ্মবেশিনী সরস্বতী) করুণ মুখচ্ছবি ও ব্যাকুলতা দস্যু-বাল্মীকিকে কবি-বাল্মীকি পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কবি নিজেই লিখেছেন: "বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা"। সেই করুণাবশে সে তার অনুচরদের হরিণ-শাবক দুটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে এবং নিজেও ঘোষণা করেছে— 'আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ'। পরে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ হত হলে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি তার মুখ থেকে অকস্মাৎ উচ্চারিত হয়েছে করুণায়। আর সেই মুহূর্তে সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটেছে। তখন দস্যুর উপাস্য দেবী কালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বাল্মীকি, লক্ষ্মীর প্রদত্ত ধনরাশি প্রত্যাখ্যান করেছে, সরস্বতীর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে। সরস্বতী আশীর্বাদ করে বলেছেন:

এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার।
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার॥

আর্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যাংশে (১৮৭৪) বর্ণিত নিম্নোদ্ধৃত বাল্মীকির কবিত্বলাভ -প্রসঙ্গটি তরুণ কবিচিত্তকে মাতিয়ে তুলেছিল:

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,

হানিল শবরে বাণ
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায় ॥
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পুরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে ॥

তার পর 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' মর্তে নেমে এলেন, মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রক্তাক্ত ক্রৌঞ্চদেহ ও ক্রন্দনরতা ক্রৌঞ্চীর দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত-ব্যাকুল করে তুলল। তখন—

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে যেন উন্মাদিনী ;
কাতরা করুণা ভরে
গান সকরুণ স্বরে
ধীরে ধীরে বাজে তাঁর বীণা বিষাদিনী ॥
সে শোক সংগীত কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি
গদ গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা সিন্ধু উথলিয়া যায় ॥

বিহারীলাল রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভের পূর্ণ বর্ণনা করেন নি, আংশিক বর্ণনা করেছেন। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বিহারীলাল সেজন্য ক্রৌঞ্চ-বৃত্তান্তের সঙ্গে সরস্বতীর বেদনা ও বীণাধ্বনির সংযোগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্মীকি-প্রতিভায় বাল্মীকিরচিত মূল রামায়ণ অনুসরণ করেন নি। তিনি অনুসরণ করেছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সেজন্য বাল্মীকিকে দস্যু নায়করূপে বর্ণনা করেছেন। দস্যু বা ডাকাতেরা সাধারণতঃ কালীপূজক ও সুরাপায়ী। রবীন্দ্রনাথও বাল্মীকিকে কালীপূজক করেছেন। দস্যুদের উপাস্য কালী লোলরসনা, হিংসার প্রতীক। এখানে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত দস্যু-রত্নাকরের কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে

রত্নাকর দস্যু হলেও কালীপূজক নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে—ধূর্জটির নির্দেশে মহাপাপী উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা ও নারদ রামনাম প্রচারের জন্য মর্ত্যে এলেন। সেখানে চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করত। সন্ন্যাসীর বেশে ব্রহ্মা ও নারদ বনের পথে এলে রত্নাকর লৌহমুদ্গরাঘাতে তাঁদের হত্যা করবার সংকল্প করল। কিন্তু ব্রহ্মার মায়ায় মুদ্গর করবদ্ধ হল এবং ব্রহ্মা যখন হত্যায় কৃতসংকল্প, রত্নাকরকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন বললেন, 'তুমি এই যে পাপ করছ এর কেউ কি অংশ নেবে?' রত্নাকর বলল, তার পাপের ভাগী চার জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৃত পাপের ভাগ সংসারের কেউই যখন নিতে স্বীকৃত হল না তখন নিজের মাথায় সে মুদ্গর দিয়ে আঘাত করল। শেষে ব্রহ্মা তাকে রামনাম জপ করতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু

পাপে জড় জিহ্বা 'রাম' বলিতে না পারে।

ব্রহ্মা একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ দেখালে রত্নাকর অনেক কষ্টে 'মরা' শব্দ উচ্চারণ করল। তখন :

মরা মরা বলিতে আইল রামনাম
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥

রামনাম জপ করতে করতে তার দেহ বল্মীকাচ্ছাদিত হল। ব্রহ্মা তখন তার নামকরণ করলেন বাল্মীকি এবং বললেন :

সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ

বাল্মীকি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় ব্রহ্মা বললেন :

সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে॥
শ্লোকছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা॥ —শ্রীরামপুরী সংস্করণ, ১৮০২

এই কথা বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন। তার পর কৃত্তিবাস ক্রৌঞ্চবধ ও 'মা নিষাদ' শ্লোকোৎপত্তি বর্ণনা করেছেন।

কৃত্তিবাস রত্নাকর দস্যুর যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস এ-কাহিনী কোথা থেকে পেলেন? ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কৃত্তিবাস-কথিত 'চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর' নেই। সেখানে ঋষি বাল্মীকি স্বমুখে পূর্বজীবনবৃত্তান্ত রামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি বললেন, 'রাম, আমি ব্রাহ্মণবংশে জাত হলেও কিরাতদের সঙ্গে বর্ধিত হয়েছিলাম এবং শূদ্রাচাররত ছিলাম। মুনিদের পথে দেখে তাঁদের পরিচ্ছদ কেড়ে নেবার সংকল্প করেছিলাম। তাঁরা আমাকে বললেন, কুটুম্বদের জিজ্ঞাসা করে এসো, তাঁরা তোমার পাপের অংশভাক্ হতে রাজি আছেন কি না। গৃহে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কেউই আমার পাপের ফলভোগী হতে রাজি হল না। তখন ধনুর্বাণ ফেলে আমি সেই মুনিদের শরণ নিলাম। তাঁরা 'রাম' নাম জপ করতে বললেন, কিন্তু অপারগ হওয়ায় 'মরা' শব্দে উচ্চারণের বিধান দিলেন। 'মরা' থেকে 'রাম' উচ্চারণ এল। এইভাবে বহুবর্ষ একাগ্রচিত্তে জপ করতে করতে আমার দেহ বল্মীকস্তূপে পরিণত হল। তখন মুনিরা আমাকে বাল্মীকি আখ্যা দিলেন।'—অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ ৬৪-৮৭

'অধ্যাত্মরামায়ণ' রামভক্তি প্রচারের কাব্য। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে রামনাম জপ করলে মহাপাপীও উদ্ধার হয়। এই পুরাণখানি রচনার শেষ সম্ভাব্য কাল চতুর্দশ শতক। কৃত্তিবাস, মাধবকন্দলী, তুলসীদাস, একনাথ সকলেই অধ্যাত্মরামায়ণের ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুশাসন পর্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকেও পাই বাল্মীকি বলছেন তিনি পূর্বে 'ব্রহ্মঘ্ন' ছিলেন পরে ঈশাণের শরণ লাভ করে পাপমুক্ত হন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর-কাহিনী এবং বিহারীলালের বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও সরস্বতী-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের রচনায় আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনদর্শন এই বাল্মীকি-প্রতিভা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে। বাল্মীকি-প্রতিভায় দেখি দস্যু-বাল্মীকির কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তর ঘটার মূলে বন্দিনী বালিকার কাতর মুখচ্ছবি ও করুণ ক্রন্দন। মানব-বাল্মীকিকে আচ্ছন্ন করে ছিল যে দস্যু-বাল্মীকি তার মুক্তি ঘটল। বাল্মীকির দস্যুরূপের, কালীপূজকের, হিংসা-সাধকের অন্তরে যে-মানবরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই মানবরূপের যেই জাগরণ ঘটল তখনই হল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। হিংসার পরিবর্তে এল করুণা— সেই করুণাবোধেরই পরিণতি ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি সাশ্রু সহানুভূতি। তখন হিংসার প্রতীক লোলরসনা কালীমূর্তির পরিবর্তে বাল্মীকির চিত্তে দেখা দিল শুভ্রবর্ণা বীণাপাণি সরস্বতী-মূর্তি। বাল্মীকির চিত্তে এই পরিবর্তন এনেছে শাস্ত্র নয়, যজ্ঞ নয়, দৈবাদেশ নয়— একটি নিরাশ্রয়া ভীতা বালিকার কাতর আকুল আবেদন। শিশুচিত্ত নিষ্পাপ, নির্মল। এই পবিত্র হৃদয়ের স্পর্শে বাল্মীকির হিংসাজনিত পাপভার দূরে গেল। এই কথাটি প্রকৃতির প্রতিশোধ ও বিসর্জন নাটকেও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও বালিকা 'রঘুর দুহিতা' এবং বিসর্জন নাটকে রঘুপতি ও অর্পণা প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভার বাল্মীকি ও বন্দিনী বালিকার পূর্ণতর রূপ। রাজর্ষি উপন্যাস ও মুক্তধারা নাটকে শিশুচিত্তের প্রভাব গোবিন্দমাণিক্য ও বিশ্বজিতের চরিত্রে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাকে মোটামুটিভাবে রূপ দিলেও তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের প্রারম্ভে পাই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পৃথিবীতে সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কে অগ্রগণ্য? ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, উদার ও সর্বভূতহিতরত কে আছেন? তিনি কি বীর্যবান, বদান্য, জিতক্রোধ ও অসূয়ামুক্ত?

বাল্মীকির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নারদ বললেন, এতগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ কোনো দেবতার মধ্যেও দেখা যায় না। তবে ইক্ষ্বাকুবংশের রামচন্দ্রের মধ্যে এই গুণগুলির চেয়েও মহত্তর গুণ বিদ্যমান। রামচন্দ্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন রামচন্দ্র নির্বিকার, মহামনা, শত্রুহন্তা, জ্ঞানী ও প্রজারক্ষক।

নারদ আরও বললেন, তিনি ধৈর্যে সমুদ্র, স্থৈর্যে হিমাচল, বীর্যে বিষ্ণু, আনন্দবর্ধনে চন্দ্র, ক্রোধে প্রলয়াগ্নি, ক্ষমায় পৃথিবী, ত্যাগে কুবের সদৃশ। রামের চরিতকথা-বর্ণনাশেষে তিনি বাল্মীকিকে বললেন, তুমি যে-সব গুণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে রামচন্দ্রে সেইসব গুণ বিরাজিত। তখন বাল্মীকি বললেন, যে-ব্যক্তি রামচরিত পাঠ করে সে সর্বাধিক পাপ থেকে মুক্ত হয়। শংকরের অনুগ্রহ লাভ করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মে বিলীন হয়। এখানেই প্রথম সর্গ সমাপ্ত হয়েছে। রামায়ণপাঠের এই পুণ্যফল বর্ণনা স্পষ্টতঃই পরবর্তী কালের যোজনা।

দ্বিতীয় সর্গে পাই বাল্মীকি নারদের প্রস্থানের পর তমসা নদীতীরে গেলেন। স্নানশেষে বল্কল পরিধান করে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করলেন। এমন সময়ে এক নিষাদ ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষটিকে নিহত করল। ক্রৌঞ্চীর বিলাপে ঋষি বাল্মীকির চিত্তে করুণরসের উদ্রেক হল, তাঁর মুখ থেকে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি উৎসারিত হল। নিষাদের উদ্দেশ্যে এই বাক্য উচ্চারণ করে তাঁর হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল :

শকুনং শোচতাহ্নেবং কিমেতদ্ব্যাহৃতং ময়া।— ১৮

এই পাখির জন্য শোকার্ত হয়ে এ আমি কি রচনা করলাম! শোক থেকে জাত বলে এর নাম হল শ্লোক। আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বাল্মীকিকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন—

শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধস্তব বাক্যস্য শোচতঃ
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥
বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্
রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মা বললেন, আমার ইচ্ছানুসারে তোমার মুখ থেকে উক্ত শ্লোক উৎসারিত হয়েছে, হে ঋষিসত্তম, তুমি নারদের মুখশ্রুত রামচন্দ্রের চরিতকথা রচনা করো।

ব্রহ্মা শেষে জানালেন, আমার অনুগ্রহে সমস্ত অবিদিত বৃত্তান্ত তোমার বিদিত হবে। এই কাব্যে তোমার কোনো বাক্যই মিথ্যা হবে না। তুমি পুণ্যরামকথা শ্লোকবদ্ধ করো। যতদিন পৃথিবীতে নদী ও পর্বতসমূহ থাকবে ততদিন তোমার রামায়ণীকথা অম্লান থাকবে।

তখন বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা আরম্ভ করলেন।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির রামায়ণ কাব্য -রচনা-প্রসঙ্গটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দ্বিতীয় সর্গটিকে প্রথমে স্থান দিয়ে তার পর প্রথম সর্গের নারদের বক্তব্যকে গ্রথিত করেছেন। ফলে কবিতাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়েছে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখি নবছন্দ লাভ করবার পর বাল্মীকি 'তরুণ গরুড় সম' মহৎ ক্ষুধা বোধ করেছেন। নারদ এসে তাঁকে নবছন্দে দেবতার জয়গান রচনা করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করলে বাল্মীকি বললেন, 'দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর', কাজেই তিনি মানববন্দনায় ব্রতী হবেন তাঁর নবছন্দ নিয়ে। তাই তিনি নারদকে প্রশ্ন করলেন :

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দরকান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।

নারদ ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন:

অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

প্রকৃতপক্ষে বীর্যবান মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই যে সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন, সেই পরিপূর্ণ মানবাদর্শই তিনি রামচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত করেছেন, বাল্মীকির বর্ণনার আক্ষরিক অনুকরণ করেন নি। মূল রামায়ণে বাল্মীকি-নারদ-সংবাদে রামচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত মহত্তর জীবনাদর্শকে ঠিক পাওয়া যায় না। গীতায় বর্ণিত 'দুঃখেষ্বনুদ্‌বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ' -রূপটিই যেন রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ফুটেছে। ঈশোপনিষদের যে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন তাকে তিনি রামচরিত্রে সমন্বিত করেছেন—

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—

দুঃখবহনের এই উজ্জ্বল আদর্শের পরিচয় বাল্মীকি-নারদ-সংবাদে নেই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা দিল হিংসার পরাজয় ও প্রেমের জয়, মানবধর্মের জয়। সেখানে তিনি কৃত্তিবাস ও বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন সেই তরুণ বয়সে। আর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে রামচরিত্রকে উপলক্ষ করে কবির চিরন্তন মানবধর্মের আদর্শ।

বোরিস পাস্তেরনাক

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পাস্তেরনাক[১] এবং তাঁর লিখিত উপন্যাস 'জীভাগো' আজ বিশ্ববিশ্রুত। এই গ্রন্থখানির জন্য লেখক নোবেল কমিটি থেকে পুরস্কার পেয়েছেন, আর পেয়েছেন তিরস্কার তাঁর দেশবাসীদের (অর্থাৎ যাঁরা রাজনীতি-সম্পৃক্ত তাঁদের) কাছ থেকে। সে বিবাদের বিবৃতি আমার বক্তব্যের অন্তর্গত নয়, আমি বলছি অন্য কথা।

শুনেছি 'জীভাগো' শব্দটি রুশ ভাষায় আমাদের 'জীব' বা 'জীবন' শব্দটির আত্মীয়—'জীভাগো' অর্থে হবে জীবন্ত, জীবনময়, জীবনধারা, এই রকমের কিছু। বইখানি তবে হল পাস্তেরনাকের জীবনবেদের কথা— জীবন, জীবনরহস্য তিনি যে চোখে দেখেছেন, তার অর্থ বা গতি যা আবিষ্কার করেছেন, তাই হল এ বইখানির মর্মকথা।

পাস্তেরনাকের জীবনবেদের প্রথম সূত্র এবং মুখ্যমন্ত্র হল— সমস্ত জীবন এক, পৃথিবীর জগতের জীবনধারা এক অভিন্ন। একই প্রাণস্পন্দ, একই গতির দোল বিশ্বের মধ্যে লীলায়িত। মানুষ পশু তরুলতা, সব একসূত্রে বাঁধা, এক সুরে এক ছন্দে এক প্রাণে তরঙ্গিত। সকলের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে রয়েছে একটা সমধর্ম সমকর্ম সমগতি, সমলক্ষ্য। এই সম্মেলনই হল পরমপ্রীতির, হয়তো একমাত্র তৃপ্তির, উৎস। আপনাকে খুলে ধরে, হারিয়ে ফেলে যদি এই বিশ্বসংগতে এক হয়ে যেতে পারে তবেই মিলবে শান্তি, স্বস্তি, পরম সার্থকতা।—

> এক নিমেষ, কোনো ভার নাই তার—
> এ ছাড়া জীবন আর কি?
> সকল জীবনের মধ্যে গলে যাওয়া
> নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে—

জীবন তার সকল ভার, গুরুভার হারায়, লঘু হয়ে প্রায় শূন্যই হয়ে যায়, যখন আমরা পারি বিশ্বের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে মিশিয়ে দিতে।

কিন্তু এই যে একপ্রাণতা, এই যে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এর অন্তরে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবার একটা বৈষম্য, একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারণ পাস্তেরনাকের জীবনবেদে দ্বিতীয় সূক্ত হল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। সমস্ত সৃষ্টি এক অভিন্ন বটে, কিন্তু তা হল একটা সমবায় অর্থাৎ ভিন্নতার নিবিড় সমষ্টি। এদিক দিয়ে যখন দেখি, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যখন অভিনিবেশ হয় তখন কিন্তু চিত্রটি হয়ে ওঠে আর-এক রকম, সম্পূর্ণ

---

১ প্রবন্ধটি লেখার পর পাস্তেরনাকের মৃত্যু হয়েছে। আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি পাস্তেরনাকের জীবন একটি ট্রাজেডি—প্রায় গ্রীক ট্রাজেডি; তাঁর মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তা তাঁর এই ট্রাজেডির যেন অব্যর্থ পরিণাম ও পরিণতি, ঠিক তাঁর নায়কের জীবনের মত।

বিপরীত। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্থ সংগ্রাম ; শুধু সংগ্রাম নয়, অন্ধকারের আবির্ভাব, ষড়রিপুর কুৎসিত লীলা। জীবন হয়ে ওঠে বিষভাণ্ড। সমস্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তির ব্যর্থতা।

তখন মনে হয় যে শান্তি যে ঐক্য যে পরম অনুভূতি পাস্তেরনাক পেয়েছেন, তা এ জগতের নয়, জগতের ভিতরে যদি থাকে তা তবে জগতের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গিয়ে ওপারের কথা কিছু। এ জগৎ হয় তখন একটা পরম মায়া— এবং মায়ারূপে দেখতে পারলেই তা হয়ে ওঠে মরীচিকা-সুন্দর। আর তা মায়া হয়ে ওঠে তখনই যখন তাকে দেখি সমগ্ররূপে। কিন্তু ব্যষ্টিরূপে সেখানে ফুটে ওঠে যে দৃশ্যতা ভয়াবহ। তখন দেখি সারা জীবনটা এক অভিন্ন, সমস্ত সৃষ্টি একজোট হয়ে রয়েছে, কিন্তু তা হল যেন বেদনার পুঁটুলি, প্রতিমূর্ত দুঃখ ও কারুণ্য— যা দিয়ে তৈরি তাঁর ইষ্ট যীশুখৃষ্ট। কবি জিজ্ঞাসা করছেন, কি বুঝতে চাও তুমি সৃষ্টি সম্বন্ধে—এই যে কাল-কবলিত, মৃত্যুর দাস জগৎখানি কি তা ?

"হায়! বিশ্বসৃষ্টি তো অতি সরল ব্যাপার একটা—চতুর লোকে অন্য কথা যাই বলুক-না—লতাগুল্মেরা পর্যন্ত অনুভব করে মর্মে তাদের বাসা করেছে মৃত্যু, ইহজগতে প্রত্যেক বস্তুরই আছে একটা সর্বশেষ!"

আরো অনুরূপ চিত্র দেখি যা দেয় একই শিক্ষা—

ধূসর প্রেতমূর্তি সব, গাছের সারি, শাখার পুঞ্জ,
পথ বেয়ে চলেছে অজস্র ধারায়,
বিদায় নিতে চলেছে নিষ্পলক রাত্রির কাছে,
নিষ্পলক রাত্রি ওদের তো কতই দেখেছে—

জীবনধারা যে কি তার সুখ-দুঃখ তৃষ্ণা-তৃপ্তি নিয়ে সে সম্বন্ধে কবি একটি কথিকা বলছেন, তাতে পাবেন জীবনের মর্ম-আলেখ্য— দেখবেন কি সুন্দর কি করুণ ছবি!

কাঁটা ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে, সুদূর এক দেশে
ঘোড়ায় চলেছে মানুষ এক, সুদূর এক যুগে,

চলেছে যুদ্ধে, কিন্তু হঠাৎ দেখে সম্মুখে
বালুরাশির মাঝে কালো ঘোর বন এক অদূরে,

অর্ধস্ফুট স্বরে কে বলে ওঠে তার আর্তপ্রাণে
'চাবুক চালাও, ঘোড়াকে জল দিতে থেমো না'।

শুনল না কথা, চলল তবু ছুটে
বনের ভিতরে, পূর্ণ বেগে,

নেমে পড়ল চড়াই থেকে, চেয়ে দেখলে উৎরাই,
ফাঁকা জায়গাটি পার হয়ে, আর-একটা পাহাড় পার হল,

সরু ফাটল দিয়ে চলল হাঁটাপথ ধরে,
দেখলে পায়ের দাগ গিয়েছে ঘাটের দিকে—

ডাক না শুনে, নিজের মনের ইশারায় কান না পেতে
ঘোড়াটিকে নিয়ে ছুটল পাহাড়গুলির শেষে।

নদী একটা— পাশে গুহা, ঘাটের উপরে
গন্ধকের আগুন জ্বলছে গুহার মুখে,

রক্তবর্ণ ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না কিছু ;
সারারাত্রি দূর হতে কার ডাকে ধ্বনিত হয়ে উঠল,

সোয়ার ধরলে তার বল্লম, দেখল চেয়ে
অতিকায় এক জানোয়ারের নাসাগ্র, আর লেজ আর আঁশ—

মুখ থেকে তার নির্গত আগুনের হল্কা, আর গ্রীবা দিয়ে
জড়িয়ে ধরেছে, ক্রমেই শক্ত করে, এক নারীদেহ, ত্রিধা বলয়ে,

তার আপন স্কন্ধেরই পাশে অজগরের কণ্ঠ—
ফুঁসছে যেন চাবুক একখানি।

দেশের রীতি—বন্দী এক কুমারীকে
অর্পণ করতে হবে বনের অজগরের কবলে,

এই শর্তেই অজগর রাজি হয়েছে
দেশের লোকের ঘরদোর বাঁচিয়ে রাখতে।

অজগরের আহার্য হল মেয়েটি,
তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরেছে, জড়িয়ে ধরেছে হাত দুখানি ;

আকুল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে একবার
সে নিশানা করল তার বল্লম অজগরকে লক্ষ্য করে,

চোখ বন্ধ করে—কত আকাশ, কত মেঘ,
কত জল, কত ঘাট, কত নদী— কত দিন, কত যুগ—

মানুষটি ভূতলে, শিরস্ত্রাণ লুটিয়ে পড়েছে,
কিন্তু বিশ্বস্ত বাহনটি কাছে দাঁড়িয়ে, ফেলছে দীর্ঘশ্বাস।

অজগরের দেহটিও পড়ে রয়েছে অশ্বটির পাশে ;
মানুষটি অচেতন, মেয়েটি মূর্ছিত।

দ্বিপ্রহর! নির্মল আকাশ! সুকোমল নীলিমা!
পৃথিবীর তনয়া? রাজার ঝিয়ারী?

কখনো অশ্রুর ধারায় ভেসে যায়, আনন্দের আতিশয্যে,
কখনো বা বিস্মৃতির তলে যায় ডুবে দুজনার অন্তর;

আবার জেগে ওঠে—কিন্তু রক্ত-ক্ষরণে
হিমশীতল ধমনী তাদের—দুর্বল ক্ষীণ দুজনেই,

চোখ বন্ধ তাদের— কত আকাশ, কত মেঘ গেল,
কত জল, কত ঘাট, কত নদী— কত দিন, কত যুগ!

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীকে একটা চিরন্তন প্রতীক করে ধরেছেন কবি— তা একটা সাময়িক ঘটমা মাত্র নয়, তা ঘটে চলল নিত্যকাল ধরে। অসমাপ্ত করুণ গাথা এই মানুষের অসমাপ্ত জীবনকাহিনী। কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে কোনো অজগরের হাত থেকে রক্ষা করতে ছুটেছে। তিনজনই দেখছি হত বা আহত রক্তাক্ত।

জীবনের এই যে করুণ ভাগ্যচক্র, এ থেকে মুক্তি নেই, উদ্ধার নেই? বুক বেঁধে কণ্ঠ চেপে বলতে হবে শুধু—

চোখের জল ফেলো না, ব্যথিত ওষ্ঠ
কুঞ্চিত কোরো না
আবার হয়তো বসন্তের ব্রণজ্বালা ফিরে দেখা দেবে।

জীবন কেবল হল এই রকম একটা নিত্য ঘূর্ণায়মান উত্থান-পতন বিম্বিত রথচক্রই—

কোথা হতে এল
এইসব চূর্ণখণ্ড, ছন্দিত যারা বেদনায়
আনন্দে, মত্ততায়, যন্ত্রণায়—

কবি বলছেন, না, তার অপরিহার্য অনিবার্য প্রয়োজন নেই, এসবেরই মধ্যে আছে একটা দিক খোলা—

"আমি বন্দী এখানে—কিন্তু রাত্রি তার নির্যাতনের মধ্যে আমাকে যতই বেঁধে রাখুক-না, আমি ছুটে বের হব, কোন অনুরাগ আমাকে সব বাঁধন ছিঁড়তে তাড়া দিয়েছে!"

ফলতঃ পাস্তেরনাকের সম্মুখে সর্বদা জাগ্রত রয়েছে খৃষ্টের মূর্তি— খৃষ্টই তাঁর জীবনের ইষ্ট, মানবীয় জীবনের আলেখ্য। এই খৃষ্ট বা ইষ্ট -অনুরাগই দিয়েছে মুক্তি তাঁকে। জীবনে সংকুল বিপদের সম্মুখে খৃষ্ট নিজেই কি কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন নি—

হে পিতা! হে পিতা! সরিয়ে নাও আমার ওষ্ঠের
কাছ থেকে এই বিষপাত্র!

কিন্তু তবুও তিনি স্বীকার করে নিলেন, পার হয়ে গেলেন কালরাত্রি—দেখলেন তার প্রয়োজন, তার সার্থকতা। কারণ, পূর্ণদৃষ্টিতে সত্যদৃষ্টিতে দেখা যায়— মানুষের উপর দুর্যোগ যখন ঘিরে আসে, জীবনের পরিণামও হয়ে

ওঠে ঘোর দুর্যোগ, বাহ্যতঃ— তাই হয় পরম সুযোগ, তাই হয় ভাগবত আশীর্বাদ, ভগবৎ-প্রসাদ— Grace ; বাইবেলে কথিত এক কাহিনী কবি বলছেন এইভাবে—

"একটা গাছ দাঁড়িয়ে— হেমন্তর গাছ— ফল ফুল পাতা শূন্য— রিক্ত শুষ্ক ডাল শুধু— হাড়গুলি যেন বের হয়ে আছে। খৃষ্ট পথে যেতে যেতে দেখলেন গাছটিকে—চেয়ে বললেন তাকে, 'তুই নিষ্ফলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস— আচ্ছা, থাক্ তবে চিরকাল ঐ রকম !' খৃষ্টের এই অভিশাপ মাথায় বহন করে গাছটি রইল ঐ রকম দাঁড়িয়ে চিরকাল।"

কবি বলছেন ভগবানের এই হল অঘটনঘটনপটীয়ান পরম আশীর্বাদ। কি রকম নিষ্ঠুর পরিহাস, নয় কি ? না, তা তো নয়—

"আমাদের বিপদের, আমাদের বিপর্যয়ের চরম যখন তখনই তিনি আমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমাদের গ্রাস করে ফেলেন।"

তাই তো বলা হয় ভগবান দিনের আলোকে আসেন না আমাদের কাছে, তিনি আসেন গভীর নিশীথে, আমাদের অজ্ঞাতে তস্করের মত— বিপদের মধ্যে সম্পদকে দেখতে পারাই হল অধ্যাত্মপুরুষের কৃতিত্ব— জগতের জীবনের যত দুঃখ তা কেবল অমিশ্র দুঃখ ?— কবি বলছেন, না, দুঃখেরই মধ্যে নিহিত সুখের রেশ, তা আবিষ্কার করাই সমস্ত জীবনের রহস্য। প্রাকৃত বোধ দিয়েও দেখা যায়, কবি বলছেন—

সমস্ত জীবনকে উষ্ণ করে তোলে
দুঃখেরই এক কণা।

দুঃখ হল তপস্যার এক রূপ, যদিও তা আরোপিত, তা স্বেচ্ছাবৃত নয়। সমস্ত প্রকৃতি এই তপস্যার মূর্তি গ্রহণ করে হিমঋতুতে, তাই মনে হয় পাস্তেরনাক হিমঋতুকে এত ভালোবাসেন এবং এত সুন্দর চিত্র দিয়েছেন তার। অবশ্য রুশদের শীতকাল বিখ্যাত এবং শীতের দৃশ্য রুশ-চেতনার অঙ্গীভূত বিশেষভাবে। পাস্তেরনাক এই শীতকে একটা প্রতীকে পরিণত করেছেন। বাহ্যপ্রকৃতি যেমন, মানুষের জীবন-জগৎটিও আন্তর সত্যের দিক দিয়ে তেমনি হল যেন কুয়াশা-কুজ্ঝটিকা-হিমানী-আচ্ছন্ন একটা বিরূপ রিক্ততা। এ রকম অবস্থায় কি করতে পার, কি করা উচিত তোমার ? আশ্রয় গ্রহণ করো নিজ নিকেতনে, অন্তরের নীড়ের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রদীপ জ্বালিয়ে। ভগবান তোমাকে দিয়েছেন এই ভাবে তোমার আত্মাভিনিবেশের পরম সুযোগ। যখন তুমি এইভাবে নির্জন নিঃসঙ্গ একাকী সর্বহারা, ভগবান তখনই পাঠিয়ে দেন তাঁর দিব্যদূত—

ধূসর কুয়াশায় সব হারিয়ে যায়,
হিমানীনিথর রাতের কোলে,
ঘরের পিলসুজে রয়েছে দীপ,
জ্বলছে তার শিখা,
শিখা কেঁপে উঠল হঠাৎ,
শত্রুর প্রলোভন ?
কিন্তু উপরে ভাসল ছায়া,
কোন্ দেবতার ?

বাহিরে এই শীতের মাসে
ঝঞ্ঝা চলেছে ঘোর রবে,
কিন্তু ঘরের পিলসুজে রয়েছে দীপ।
জ্বলছে তার শিখা।

আমার মনে হয় খৃষ্টের যে দুটি মহাবাক্য, তার মধ্যে পাওয়া যাবে তিনি জীবনসমস্যার কি মীমাংসা দিয়েছেন এবং পাস্তেরনাক সেই ভাবের ভাবুক হয়েই গড়েছেন তাঁর জীবনবেদ। প্রথম মহাকাব্য হল—

The Kingdom of Heaven is within you.

স্বর্গরাজ্য রয়েছে অন্তরে তোমার। অন্তরের আয়তনেই শান্তি, স্বস্তি, জ্যোতি, পরমপ্রীতি। কিন্তু এর অর্থ নয় বাহিরের জীবনও হয়ে উঠবে নির্বিঘ্ন, নিরাময়, সুখময়। তা আশা করা যায় না, আশা করা উচিতও নয়— বাহ্যজীবন, প্রাকৃতজীবন, প্রকৃতির গতি স্বভাবতঃই হল দ্বন্দ্বসংকুল বিরোধবিঘ্নিত। বলেছি, প্রাকৃতিক জীবনে ঊষর হিমঋতু আছে, খৃষ্টের জীবনে তাই তো এল জুডাস, এল পীটরেরও প্রতারণা, তাই খৃষ্টের দ্বিতীয় মহাবাক্য—

Render unto Caeser what is Caeser's

অর্থাৎ প্রকৃতির দুর্যোগ এড়িয়ে চলা যাবে না, তাকে স্বীকার করতে হবে, তার ভিতর দিয়ে চলতে হবে— এভাবে চলতে চলতেই সন্ধান পেতে হবে অতি-প্রাকৃতের— এই সাহস থাকা চাই, দুর্যোগের রাত্রি পার হবার। এই রকম এক অন্ধকার বর্ষার রাত্রিতে বনজঙ্গল পার হয়ে

মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈ
নক্তং—

শ্রীরাধা কি চলেন নি শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে? পাস্তেরনাকও বলছেন তাই—

সাহস থাকলেই দেখা যায় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে,
এই বস্তুই তো আমাদের অন্তরে আমাদের প্রলুব্ধ করে চলেছে।

দুর্যোগকে সুযোগ করতে হয় এই রকমে, বাধা-বিপত্তিকে বহন করে (খৃষ্ট যেমন বহন করেছিলেন ক্রুশ) অথবা বাহন করে (আমাদের দেবতারা যেমন করেছেন এক-এক জীবকে)।

কাব্যবিতান। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

কাব্যদীপালি। শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য বারো টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রীবুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

কবিতা রচনা করা এবং কবিতা সংকলন করা, কোন্‌টা যে বেশি শক্ত এই নিয়ে একটি কৌতুকপ্রদ বিতর্কের অবতারণা হতে পারে। কবিতা লিখতে যিনি ব্যর্থ হলেন তিনিই হয়ে বসলেন ক্রিটিক, এই উক্তিটি বহুপ্রচলিত। তবু এটাও ঠিক যে সত্যিকারের ক্রিটিকের কর্তব্য সহজ মোটেই নয়। কেননা, ক্রিটিককে কেবল কতকগুলো বই মুখস্থ করে সমালোচনার সূত্র শিখলেই চলে না, তার সঙ্গে আরো একটি জিনিস দরকার যা বড়ো সহজলভ্য নয়। এমন-কি কথাটা অন্য দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনার চেয়ে সংকলনের মধ্যেই বরং সেই দুর্লভ বস্তুটির নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কবিতাকে বেছে নেবার রসবোধের স্বাধীনতা আছে। অবশ্য সংকলনকর্মে শুধু রসবোধই নয়, সমালোচনাশক্তিরও সমান প্রয়োজন। সংকলন যদি বিভিন্ন কবির রচনা থেকেই হয়, তবে বাছাই করা নানা কারণে দুরূহ হয়ে ওঠে। বাছাইয়ের কোনো স্পষ্ট নীতি স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেউ দেশপ্রীতিমূলক কবিতা সংগ্রহ করতে পারেন, কেউ প্রেমের কবিতাকে নিয়েই শুধু সংকলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ স্পর্শক্ষম মান স্থির করে নেওয়া যেমন শক্ত নয়, তেমনি সহজ নয় এরই মধ্যে ভালো কবিতা বেছে তোলা।

কোন্ কবিতা রসোত্তীর্ণ, কোন্ কবিতা নয়, তা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য কেউ এ পর্যন্ত বলতে পারেন নি। তবু রসিক ব্যক্তি মোটামুটি সেটা বুঝতে পারেন। গত্যন্তরহীন হয়ে এ কথাই বলা যায় যে কবিতা যদি ভালো হয়, তাহলে সে নিজের শক্তিতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে রসকে বলা হয়েছে অলৌকিক; দেশ-কালের লৌকিক প্রেরণা বা রুচি রসের নিয়ন্তা নয়। লৌকিকতার বাঁধনমুক্ত বলে এই সংজ্ঞার সর্বজনগ্রাহ্য হবার যুক্তিগত যোগ্যতা আছে। তবু কবিতা সত্যই অলৌকিক কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যেহেতু রুচিকে অতিক্রম করা প্রায় পর্বতলঙ্ঘনের মতই দুঃসাধ্য। 'আধুনিক'-অভিধেয় কবিতা নিয়ে সংশয়ের কথা অনেকেই স্মরণ করবেন। অথচ কাব্য-সংকলনকালে রুচিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যেমন সংগতও নয়, সম্ভবও নয়, তেমনি শুধু রুচিকে মাত্র অবলম্বন করেও সাফল্যলাভের সম্ভাবনাও অল্প। কারণ বহু কবির রচনাসংকলন অর্থ একটা লৌকিক উদ্দেশ্যকে মর্যাদা দেওয়া। সংকলনকার্যে আত্মনিষ্ঠা এবং পাঠকনিষ্ঠা দুয়েরই সমান প্রয়োজন।

সংকলন-গ্রন্থ কিছু আধুনিক নয়। সংস্কৃতে প্রাকৃতে এমন-কি মধ্যযুগের বাংলাতেও সংকলন ছিল। কিন্তু সেগুলি সংকলনই ছিল, নির্বাচন ছিল না। সংকলনকর্ম পুরনো, নির্বাচনকর্ম আধুনিক। প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ নির্বাচিত সুনির্বাচিত কিংবা স্বনির্বাচিত নয়। রসাস্বাদনের সঙ্গে যখন সমালোচনাবুদ্ধি যোগ দিল, তখন সূচনা হল কবিতা নির্বাচনের। আধুনিক প্রথম বাংলা কবিতা-সংকলনগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য করে তুলবার জন্যই করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কবিতার বিচিত্রধর্মিতাকে সঞ্চারিত করার প্রয়োজন হল, আবার সুকুমারমতি শিশুদের নীতিশিক্ষার দায়িত্বও এসে পড়ল। কবিতাপাঠের সঙ্গে এমনি করে এক ধরণের বিচারবোধ দেখা দিল। এখন সংকলন মানে শুধুই সংগ্রহ নয়, সংকলন মানে নির্বাচন এবং নির্বাচককে শুধু রসিক হলেই চলে না, তাকে হতে হয় সমালোচক।

শুধু বিদ্যালয়পাঠ্য হওয়া ছাড়াও সংকলন-গ্রন্থগুলির মহত্তর উদ্দেশ্যও আছে। পাঠকদের মধ্যে সাধারণভাবে কবিতা সম্পর্কে ঔৎসুক্য সঞ্চার করাও একটা বড়ো কাজ। নানারকম বিবেচনায় এই শ্রেণীর কাব্যসংগ্রহ বাধাগ্রস্ত থাকে বলে কবিতার ভাব ও রূপকর্মগত বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কৌতূহল যেন গড়ে উঠতে পারে না। সাধারণ পাঠকের জন্য আরও স্বাধীনভাবে নির্বাচন বাঞ্ছনীয়। নির্বাচনের সময় কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাফল্যের প্রতিও মনোযোগ রাখা সংগত। সাহিত্যধারার গতি-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়েই রসবোধ এবং বিচারবোধের মণিকাঞ্চনযোগ ঘটে।

বাংলা কবিতার এই সংকলন-গ্রন্থগুলিতে পাঠকের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হবে। বাংলা কবিতার বৈচিত্র্য সম্বন্ধে একটা ধারণা মোটামুটি এতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। এদের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী এবং শ্রীযুক্ত তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কাব্যবিতান' অবশ্য সবচেয়ে ব্যাপক, অর্থাৎ সমস্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে ব্যাপ্ত করেই নির্বাচিত। এই সংকলনের মানদণ্ড সম্পাদকদ্বয়ের ব্যক্তিগত রসবোধ এবং রুচি— এ কথা তাঁরা খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। এই রুচির অবশ্যই কোনো সর্বজনগ্রাহ্যতা নেই, সে সম্বন্ধেও তাঁরা অবহিত। সুতরাং যে সব কবিতা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তাদের উপযুক্ততার কোনো কৈফিয়ত নেই। তবে নির্বাচনকার্যে যে রসবোধ এবং সমালোচনাশক্তির দ্বৈতগুণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছি, সুপরিচিত সম্পাদকদ্বয়ের উপর পাঠক সে বিষয়ে আস্থা রাখতে পারবেন সন্দেহ নেই। যে ২৮৮টি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, তার প্রতিটি সমান দরের অবশ্যই নয়— বস্তুত সমান দরের কবিতা চয়ন করা অসম্ভব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এই অসংগতি কাব্য-সংকলনে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কবিতা 'লিরিক'-জাতীয় রচনা বলে লিরিক-গুণযুক্ত পদ বা কবিতাই এতে গৃহীত হয়েছে। ফলে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের বিরাট অংশ মঙ্গলকাব্য এবং চরিতগ্রন্থ হলেও এদের থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ অল্প। আধুনিক-পূর্ব যুগের কবিদের মধ্যে বৈষ্ণব পদ, বাউল গান, শাক্ত এবং টপ্পা গানের অনায়াস অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু 'লিরিক' মাধুর্যের সন্ধানই যদি কবিতা-সংকলনের প্রেরণা হয়, তাহলে কাব্যক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসে। ফলে নজরুলের 'ছায়ানট' এবং 'চক্রবাক' থেকেই শুধু কবিতা নেওয়া হয়েছে। অনেকেই যদিও মনে করেন নজরুলের সংগীতধর্মী রচনাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ, তথাপি এই সংকলন থেকে নজরুলের খ্যাতির আদি কারণটি অনভিজ্ঞ পাঠক জানতে পারবে না। 'আধুনিক' নামে পরিচিত কবিদের সেইসব কবিতাই গৃহীত হয়েছে, যেগুলিতে আবেগ আছে এবং যেগুলির রূপকর্ম অনুধাবনে বেগ পেতে হয় না।

প্রমথবাবু তাঁর লিখিত ভূমিকায় আধুনিক কবিতা সম্পর্কে সরস ব্যঙ্গ বর্ষণ করে শেষে কিছু সান্ত্বনাবারি সেচন করেছেন। স্বভাবতই আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই স্থান পেলেও তাঁদের কাব্যবৈশিষ্ট্যের পূর্ণরূপ ফোটে নি, এ কথা গোপন করে লাভ নেই। পুরনো যুগের কবিদের নিয়ে বিতর্ক কম লোকেই করবে, কারণ তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিবিভাগের সম্পদ বলে বিবেচিত হবেন; তাঁদের উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা নিয়ে বেশি কেউ মাথা ঘামাবেন বলে মনে হয় না। ঊনবিংশ শতকের কবিতারও প্রায় সেই অবস্থা হতে চলেছে। এর আসল কারণটি অনুধাবন করা প্রমথবাবুর মতো রসিক অধ্যাপকের পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নি। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি স্পষ্ট এবং চিন্তাযোগ্য। কিন্তু হেমচন্দ্রের যে কবিতাটি তিনি তুলেছেন, লোকে বলে বাংলা সাহিত্যে ওটাই নাকি একমাত্র বীভৎস রসের কবিতা। এই কবিতার সন্নিবেশের কারণ কি সম্পাদকীয় বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা, না হেমচন্দ্রের কাব্য-বালুতটে রসের স্বর্ণরেণু সন্ধান? কবিতা-নির্বাচনের ব্যাপারে একদিকে যেমন সম্পাদক 'লিরিক' গুণের উপরেই একান্ত নির্ভর করেছেন, তেমনি চেষ্টা করেছেন বহুপরিচিত কবিতা বাদ দিতে। দৈবক্রমে বহুপরিচিত, একটি বা দুটি কবিতাই কবির খ্যাতির একমাত্র ভরসাস্থল— এ রকম ধারণার প্রতিকূলতা করাই তাঁর উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। তিনি নিজেকেও কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন— বাঁধা পথ ছেড়ে নতুন পথ তৈরি করবার দায়িত্ব স্বীকার করে। সে পরীক্ষায় তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না। রবীন্দ্রনাথের সেই সব কবিতাই সংকলিত হয়েছে, সাধারণত যেগুলি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় না। মোহিতলালের সংকলন-খ্যাত 'পান্থ' এবং 'কালাপাহাড়' বাদ দিয়ে আর একটি অবিস্মরণীয় কবিতা 'মৃত্যু ও নচিকেতা'কে গ্রহণ করে স্বাদবদলের সহায়তা করেছেন। তেমনি আবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের তির্যক ভঙ্গিতে রচিত কবিতা বাদ দিয়ে খাঁটি রোমান্টিক কবিতা নেওয়াতেও অভিনবত্ব আনা হয়েছে। আর একটি লক্ষণীয় এই যে, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো কবিরই সংকলিত কবিতার সংখ্যা দুয়ের বেশি নয়। এ দিক থেকে প্রমথবাবু সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। এটা আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ পরিমাণবোধের অভাবে গুণগত এবং সংখ্যাগত দুদিক থেকেই পাঠকের বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বস্তুত কাব্যবিতানের কবিতা সংকলিত হয়েছে নিপুণভাবেই। এই শ্রেণীর সংকলনে অনুবাদ-কবিতা স্থান পায় না কেন? *Oxford Book of Modern Verse*-এ কিন্তু বিদেশী কবির ইংরেজি অনুবাদ সসম্মানেই গৃহীত হয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যের কমনীয় মাধুর্যের আস্বাদন যেমন করায় 'কাব্যবিতান', তেমনি বিষয়ানুগত শ্রেণীবিভাজনের দিকে পরিপূর্ণ লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখে একটা বিশিষ্ট যুগের কবিদের সম্বন্ধে এক রকমের ধারণা জন্মাতে সাহায্য করে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন'। 'কাব্যবিতানে' মূলত কবিতার রসবস্তুর উপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল, তাই বিষয়বৈচিত্র্য শিল্পবৈচিত্র্য কিংবা যুগলক্ষণ নির্ণয় ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো পৃথক সচেতনতার পরিচয় নেই। এমন-কি কবিদের জীবিতকালও বোঝবার কোনো উপায় নেই। সম্ভবত এই সব খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগী হলে বই নেহাতই টেক্‌স্‌ট-বইয়ের আকার নেবে— সম্পাদকের এ রকম আশঙ্কা থেকে থাকবে। ফলে 'কাব্যবিতান'

ভালো কবিতার সংগ্রহ হয়েছে বটে, কিন্তু যাঁরা কবিতার শুধু রসাস্বাদন নয় অধ্যয়ন করতে চাইবেন তাঁরা কিঞ্চিৎ অসুবিধাই বোধ করবেন। বৃহৎকায় 'গীতিকবিতা সংকলনটি' আবার ঠিক এর বিপরীত। পাঠ্য, অপাঠ্য, দুষ্পাঠ্য প্রভৃতি নানাজাতীয় ৪৬৬টি কবিতার গহন অরণ্যের মধ্যে পাঠক যাতে পথ না হারান, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ছয়টি খণ্ড ভাগ করে— প্রেমবিষয়ক, দেশপ্রেমবিষয়ক, গার্হস্থ্যজীবনবিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক, বিষাদবিষয়ক, তত্ত্ববিষয়ক। এই ছয়ভাগের দ্বারাই পাঠকেরা পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা কাব্যের (১৮৬০-১৯১০) রূপরীতি বেশ ভালো ভাবেই অনুধাবন করতে পারবেন।

এই সংকলনটির বৈশিষ্ট্য এই যে এতে কবিতা শুধুই মুদ্রিত গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয় নি। পুরনো মাসিক পত্র থেকেও উপযুক্ত বিবেচনা করলে সম্পাদকদ্বয় কবিতা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের রুচিবোধ কিছু উদার বলেই মনে হয়। প্রবীণ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কবিরা সহজেই পাসের মার্ক পেয়ে যান বলে মনে হল। সারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে বিশী মহাশয় যেখানে ২৮৮টি কবিতা চয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাশ বৎসরের পরিধি থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে ৪৬৬টি কবিতা বেছে নিয়েছেন। কবিদের কবিতাসংখ্যাও নির্দিষ্ট রাখেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের বাংলা কবিতার আকৃতি-প্রকৃতি বোঝানোই এই সংকলনের উদ্দেশ্য। কবিতার মান সম্পর্কে ততটা বিচারপ্রবণ না হয়ে বরং তার বৈচিত্র্যের দিকেই ঝোঁক তাঁরা বেশি দিয়েছেন। অর্থাৎ গীতিকবিতা সংকলনে ছাত্রদের প্রয়োজনই তাঁদের প্রধান চিন্তনীয় হয়েছে বলে মনে হয়। প্যালগ্রেভের কাব্য-সংকলনের মতো একটা বিস্তৃত এবং প্রয়োজনীয় কার্যসিদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় এই অভিধানাকৃতি বিপুল গ্রন্থটিতে কবিতা সংকলনের ব্যাপারে অসতর্কতার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মাতৃস্তুতি' দেশপ্রেমের অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশপ্রেমবিষয়ক ছাড়া গান সংকলিত হয় নি, এ কথা বলা হলেও রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির একাধিক গান 'বিষাদবিষক' এবং 'গার্হস্থ্যবিষয়ক' অংশে ঢুকে পড়েছে। নবীনচন্দ্র সেনের 'পিতৃহীন যুবক' তত্ত্ববিষয়ক কবিতারূপে শ্রেণীভুক্ত হবার উপযুক্ততা কি ? কবিতার মূল উৎস নির্দেশেও সংগতির অভাব রয়ে গিয়েছে। কবিদের তালিকায় আলাদা করে জীবিতকাল নির্দেশ করা হলেও কবিতাতে কোথাও কবির সময় দেওয়া আছে, আবার কোথাও দেওয়া নেই। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং প্রিয়নাথ সেনের কবিতাও এতে সম্ভবত অনবধানতাবশতঃ গৃহীত হয় নি।

এসব ত্রুটি এমন কিছু মারাত্মক নয়। নতুন সংস্করণে অনায়াসেই সংশোধন করে নেওয়া চলবে। এ বইটির উপযোগিতার কথা বিবেচনা করলে এ সব আপাততঃ উপেক্ষা করলেও ক্ষতি নেই। বাংলা গীতিকবিতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে এ যুগের পাঠকদের পরিচয় সাধনই এর উদ্দেশ্য। বিস্তৃত ভূমিকায় সম্পাদকেরা সে বিষয়ে সাহায্যও করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান সংকলনে বাদ দেওয়ার কারণ "উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতে হইলে তাঁহাকে দূরে রাখাই প্রয়োজন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা যে অমূল তরু নহে তাহা গত শতকের গীতিকাব্যভূমি হইতেই প্রাণরস আহরণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় এই সংকলনে"। গীতিকবিতা সংকলনের ভূমিকায় সেকালের কাব্য

সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের আলোচনা করা হয়েছে। এটা পড়লে পাঠকদের একটা সুসম্বদ্ধ ধারণা গড়ে উঠবে আশা করি। অবশ্য কয়েকটি মন্তব্য বিতর্কমূলক। যেমন,

'কবিতাবলীতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ শেলীর নিকট।' পৃ ১৵০

'রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার জোরেই হৃদয়াবেগকে ইহারা [মহিলা কবিরা] সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন।' পৃ ১৷০

'বিষাদ রবীন্দ্রকাব্যে বরাবরই বর্তমান।' পৃ ১৷৵০

'গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য, বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিপ্রধান ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপ লাভ করে।' পৃ ।৶০

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'কাব্যদীপালি' এবং শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবার বিশেষ এক রীতি অবলম্বনের ফলে একই শ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য! 'কাব্যদীপালি' প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩৩৮) পর তৃতীয় সংস্করণে (১৩৬৬) অনেক নতুন কবি স্থান পেয়েছেন। এক সময়ে 'কাব্যদীপালি' প্রায় একক সংকলন-গ্রন্থই ছিল বলা চলে। সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশের সময় বাংলা কাব্যের আরো সংকলন বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে জন্য এর উপযোগিতা যে কিছু কমেছে তা নয়। মধ্যযুগোত্তর বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এতে। সংকলকদ্বয়ের ভাষায় 'এবার কাব্যদিপালী হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ— এই দুই কালের কাব্যনির্দেশিকা।' এই দাবির মধ্যে কিছু যে সত্য আছে, তাতে সন্দেহ নেই। যদিও এ কথা ঠিক যে বিশেষ এক শ্রেণীর কবিতা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখলে আধুনিক বাংলা কাব্যের বৈচিত্র্যের স্বাদ ঠিক দেওয়া যায় না, তথাপি এ কথাও ঠিক বাংলা কবিতার উৎকর্ষ ঘটেছে প্রধানত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেই। একেবারে সাম্প্রতিক কালের কবিদের অবশ্য মোহভঙ্গ হচ্ছে বলে শোনা যায় এবং বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে প্রেমে পতন ছাড়া কিছু নেই। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা হলেও প্রেমকে বাদ দিয়ে প্রায় কোনো কবিই কবিতা লিখতে পারেন নি (সমর সেনও না, সুকান্ত ভট্টাচার্যও না)—সব কবিই এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের মূল সুরটি উঠছে। অবশ্য ভালো প্রেমের কবিতা বাছতে গিয়ে মানদণ্ডটি কিছু ঢিলে করতেই হয়েছে। নিছক্ রোমান্টিক উন্মনস্কতাকেও প্রেমেরই সুর বলে ধরে নিতে হয়েছে, সুতরাং এ কথা বলাই ঠিক হবে—রোমান্টিক ভাবই হচ্ছে 'কাব্যদীপালি'র কবিতা বাছাইয়ের মান। প্রেম আর প্রকৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান বিষয় হলেও প্রেমের মধ্যে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের ছায়াপাত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটছে। অন্য ধরণের কবিতা যথেষ্টই রচিত হলেও যাঁরা মনে করেন প্রেমের নন্দনস্বপ্ন রচনাতেই রস, সেই সব রোমান্টিক পাঠক 'কাব্যদীপালি' পড়ে তৃপ্তি পাবেন।

'কাব্যদীপালি'তে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত কবিরাও স্বীকৃত হয়েছেন। ভালো প্রেমের কবিতা নির্বাচনে সম্পাদক সে দ্বিধা বর্জন করেছেন; এবং এ কথাও সত্য যে ভালো কবিতা বলতে শব্দ এবং ছন্দ, এই দুই দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের পূরবী-মহুয়ার যুগ পর্যন্ত কবিতার প্রসাধন-পারিপাট্য বাংলা কাব্যের একটা যুগের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-পূর্ব বলে পরিচিত কবিদের এ বিষয়ে শৈথিল্যকে মার্জনা করে শুধু নামের জন্যই যেমন কবিতা নির্বাচন করা হয় নি, তেমনি আবার রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংশয়কেও এই সংকলনে পরিহার করা হয়েছে। মোটামুটি

বলা যায়, যে-অঙ্গসজ্জাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত এবং প্রচলিত করে গিয়েছেন, কবিতার সেই রূপকর্মকেই 'কাব্যদীপালি'তে বিশেষভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিরা যেমন আছেন, রবীন্দ্র-পরবর্তীরাও তেমনি আছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা কাব্যভাষায় যে পরিচ্ছন্নতা, শব্দচয়নে যে শুচিতা এবং মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে যে মিষ্টতা এসেছে, কখনও কখনও কাব্যকে তারা কৃত্রিম করে তুলেছে, এ কথা সত্য। কোনো দুজন কবির রচনাকে আলাদা করে নেওয়াও শক্ত হয়ে ওঠে, কবিতা কখনও কখনও এমনই রীতিবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। নতুন শব্দসম্পদ অনেক সময়েই সৃষ্টি হয় নি, নতুন কোনো শব্দচিত্রও তেমন গড়ে ওঠে নি। রোমান্টিক কল্পনার প্রাধান্যের যুগে সংস্কৃত কাব্যে প্রচলিত শব্দ, অনুপ্রাসের শিঞ্জিনী, রবীন্দ্রনাথ-উদ্‌ভাবিত ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রেম নামক এক চিরকালীন অনুভূতির কবিতা বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে বলে ক্লাসিকাল শব্দ প্রয়োগ স্বাভাবিক। যদিও 'কাব্যদীপালি' আধুনিকতর কবিদের স্বীকার করে নিয়েছে, তবু কবিতা-নির্বাচনে ঝোঁকটা এইসব গুণের উপরেই পড়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করতে গিয়েও অতিপ্রসাধিতা 'পূরবী'-র পরে সম্পাদকেরা অগ্রসর হন নি। এই সময়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য কবি দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষাকে পরিপাটি সুন্দর এবং শুচি করে তুলেছেন। 'কাব্যদীপালি' মূলত সেই সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন বলে গৃহীত হতে পারে। কবিদের নামের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে কবিতাগুলি সাজানোতে নিছক কাব্যরস ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিক অথবা আর কোনো বিবেচনা কবিতা-সংকলনে প্রযুক্ত হয় নি।

এই বিবেচনা করেই সংকলিত হয়েছে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (কবিতা-সংখ্যা ২০০)। এই বই প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪০এ। তারপর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় এর তিনটি সংস্করণ হয়েছে। 'কাব্যদীপালি' যেমন মূলত প্রেমের বিষয় নিয়ে প্রস্তুত, এটিও তেমনি অন্য একটি সুনির্দিষ্ট পূর্ব-কল্পিত নিরিখ নিয়ে সংকলিত। বাংলা কবিতার আধুনিকত্বের একটা সুষ্ঠু পরিচয় দিয়ে বুদ্ধদেববাবু কবিতা নির্বাচন করেছেন। সুতরাং এদিক দিয়ে তাঁর কৈফিয়ত খুবই পরিষ্কার। এতে কোনো অনুযোগ ওঠার সম্ভাবনা অল্পই। যদি ওঠে তা হলে সেই পুরোনো তর্কই উঠবে— আধুনিকতা কি, আধুনিক না হলে কি কবিতা হবে না, ইত্যাদি। সেসব প্রসঙ্গ এখানে অপ্রয়োজনীয়। এই সংকলনের ভূমিকায় বুদ্ধদেববাবু যে কথাগুলি বলেছেন, এ বিষয়ে তাকে শেষ কথা বলেই মনে করি। তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাঁদের মনোভাব এতে খুবই স্পষ্ট। "এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয়, যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের প্রতিবাদের কবিতা; সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের; আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তি।"

সংশয় বা বিদ্রোহের মধ্যে যদি বা নূতনত্ব থেকে থাকে বিশ্ববিধানে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তিতে নূতনত্ব নেই। তবু এও যদি আধুনিক কবিতা বলে গৃহীত হয়, তবে অবশ্যই 'আধুনিকত্ব' বলতে আরো কিছু বুঝতে হবে। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে গভীর বিশ্বাসের সুর আছে কিংবা জীবনানন্দের মধ্যে আছে করুণ বিষণ্ণতার সুর। তবু তাঁরা আধুনিক। আধুনিকতা একটা বীক্ষণ-বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের ভাষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কবিতার ভাষায় তির্যক ভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন, আর মোহিতলাল

এনেছিলেন স্পষ্ট ভাষণ, আর নজরুল এনেছিলেন সমাজচেতনা। এই তিনের স্বাভাবিক পরিণতিতে আধুনিক বাংলা কবিতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য। ইতিহাসের সূত্রে এই তিনজনকে স্মরণ করি বটে, কিন্তু আধুনিকতার নিজস্ব বিকাশে বাংলা কবিতা অনেক দূরে সরে এসেছে। একটা বড় বিশেষত্ব এ যুগের কাব্যের সীমাতিক্রান্ত অ্যাবসট্রাক্ট চরিত্রলক্ষণ। এ যুগের কবিতায় সেই ছাপ পাওয়া কঠিন, যেটা বাংলা কবিতার ধারায় এতকাল চলে এসেছিল। বাঙালী বা ভারতীয় স্বভাব নিয়ে যে বাগ্‌বাহুল্য এতকাল আমরা করে এসেছি, আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা কঠিন। হয়তো আধুনিক কবিতার সুবোধ্যতার পক্ষে সেটাই প্রধান বাধা। কাব্যসংস্কারকেও বদলাতে হচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রীতিকর যদি কখনও কখনও মনে নাও হয়, তবু স্বীকার না করে উপায় নেই। 'মানুষ' বলতে যদি কোনো দেশকালাতীত সত্তাকে বোঝায়, তবে এই নতুন অর্থ বোঝাতে নতুন সংকেত এবং প্রতীক আসবেই। ফর্মের এই সব নূতনত্ব দিয়েই আধুনিকতা, এর প্রচুর বিচিত্র দৃষ্টান্ত বর্তমান সংকলনে ছড়িয়ে আছে।

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র মনোরম্যতা শুধু সেখানেই নয়। সংজ্ঞাকে ব্যাপক করার ফলে বিচিত্র এবং বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন আধুনিকদের সমান মর্যাদার সঙ্গে সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে। কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা কালিদাস রায় বাদ গিয়েছেন কারণ তাঁদের কবিতায় এক ধরণের কাব্যসংস্কার আছে যা এ যুগের কবিরা বর্জন করতে চান। কিন্তু তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়ই ফাঁক নেই। বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে ফর্ম নিয়ে তাঁরা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করেন না। ফর্ম নিয়ে কোনো নতুন পরীক্ষা করেন নি বলেই আধুনিকরূপে তাঁরা গণ্য নন। 'কাব্যবিতানে' বা 'কাব্যদীপালি'তে এঁদের স্থান হবে, কিন্তু 'আধুনিক কবিতা সংকলনে' তাঁরা নির্বাচিত হবেন না। 'আধুনিকত্ব' এবং 'কবিত্ব' এ দুয়ের মিলন যিনি ঘটিয়েছেন, এতে তিনিই প্রবেশাধিকার পাবেন। এই সীমা মেনে নিয়ে সম্পাদক কবিতা বাছাইয়ে যে ঔদার্য দেখিয়েছেন, তা শ্রদ্ধাযোগ্য। অজিত দত্তের রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে আছেন বিষ্ণু দের বাস্তব-তীক্ষ্ণতা, জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ বেদনাবোধের সঙ্গে সমর সেনের বিদ্রূপাত্মক সমাজজিজ্ঞাসা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মরবিড নাস্তিক্যবোধের সঙ্গে আছে অমিয় চক্রবর্তী এবং অন্নদাশংকরের বিশ্বাসের গভীরতা। তরুণতর কবিরা সকলেই যে কিছু নতুন সুর কিংবা নতুন মনোভাব নিয়ে আসছেন, তা না হলেও কবিতারচনার বিশিষ্ট রীতির উপর অধিকারের ফলে এঁরাও মর্যাদা পেয়েছেন। সর্বকনিষ্ঠ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯৩৩)। যে প্রভূত সমর্থন অগ্রজ আধুনিকেরা পেয়েছেন, তাতে এটাই মনে হয়, আধুনিকতা বস্তুটা হয়তো শুধুই উন্মার্গগামিতা নয়। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের এটাই সর্বোত্তম সার্থকতা।

ভবতোষ দত্ত

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা ৯। মূল্য ৩·২৫ টাকা।

নিবেদনে লেখক বলেছেন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এই শ্রেণীর বই এই প্রথম। কথাটা অযথা নয় এই অর্থেই যে, গদ্যের শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে বিশেষ হয় নি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'বাংলা গদ্যের ইতিহাস' লিখেছেন। স্পষ্টতই অরুণবাবু তাঁর বইকে ওই বই থেকে কোনো কোনো দিক দিয়ে আলাদা করতে চান। 'কথারম্ভ' নামে প্রথম অধ্যায়টিতে লেখক তাঁর আলোচনার পরিধি নির্দেশ করে বলেছেন,

"বাংলার বড় বড় প্রবন্ধকার আমার আলোচনার ক্ষেত্র নন। যাঁরা বাংলা গদ্যকে গড়ে পিটে তুলেছেন, দুরূহ চিন্তা প্রকাশে সক্ষম ও সূক্ষ্ম আলোচনার যোগ্য বাহন করে তুলেছেন আমি কেবল তাঁদেরই গদ্যরীতি বা স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করেছি।" সুতরাং ইতিহাসরচনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তিনি বিশিষ্ট গদ্যলেখকের স্টাইলের নিজস্বতা বোঝাতে চেয়েছেন এবং এইজন্য ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য না রেখে এক-এক জনের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকলার আলোচনা করেছেন। সুতরাং লেখকের সমালোচনার অভিনবত্ব আছে। তবে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' বইখানা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে লেখা হলেও শিল্পরূপের আলোচনাও তিনি কিছু কিছু করেছিলেন বটে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে কুন্তকই রচনার অনন্যপর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছিলেন। রীতি কথাটির দ্বারা এই অর্থকে ঠিক বোঝানো যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রচনার দিক দিয়ে গীতা এবং কালিদাসের কাব্য একই রীতিভুক্ত, কিন্তু নিশ্চয়ই স্টাইল এক নয়। এই ব্যক্তিত্ববোধক স্টাইলই অরুণবাবুর আলোচ্য। কারও ভাষা সংস্কৃতবহুল বা চলতি বললে রীতিই বোঝায়, স্টাইল নয়। অরুণবাবু এই দিক দিয়েই বাংলা গদ্যের শিল্পরূপের আলোচনা করতে চেয়েছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের সংস্কৃতভারবহুল ভাষার আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র যুগের ধ্বনিমন্দ্রিত আলোচনার তুলনা করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন অরুণবাবুর অভিপ্রায় কি।

যাই হোক, বইয়ের শেষে 'উনিশ শতকের গদ্য' এবং 'গদ্যের ভবিষ্যৎ' নামে দুটি প্রবন্ধের মধ্যে সামগ্রিক আলোচনা করে ঐক্যসূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি প্রণিধানযোগ্য। লেখক এখানে এই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন, "উনিশ শতকে যুক্তিপন্থী গদ্যের বহুল চর্চা না করেই আমরা কাব্যগুণসমৃদ্ধ আলংকারিক গদ্যচর্চা করেছি। তার উপর রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্য অপূর্ব শ্রী ও সুষমা -মণ্ডিত হয়েছে, অলংকারের নিক্বণে ও ধ্বনিরোলে আমরণ দিশেহারা হয়ে গেছি। ফলে তাল রাখতে পারি নি— বাংলা গদ্যের আজ অবনতি ঘটেছে।" রম্যরচনার অতিচর্চার যুগে কথাটা সত্য; কিন্তু সবটাই কি সত্য? প্রমথ চৌধুরী -প্রভাবিত বাংলা গদ্যের সম্পর্কে কথাটা কি সম্পূর্ণ মেনে নিতে হবে? অরুণবাবু এই উক্তিটি বিস্তারিত করলে ভালো করতেন। বাংলা গদ্যের এটা একটা বড় প্রশ্ন, সুতরাং আলোচিত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব বাংলা গদ্যের উপর বিশেষ করে পড়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন, সেটা কোন্‌টা— সবুজপত্র-পূর্ববর্তী না সবুজপত্র-পরবর্তী?

আকারে ক্ষুদ্র হলেও 'বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ' এমন-একটা বই যা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে না। শুধু এর বিষয়বস্তুর জন্যই নয়, আলোচনার ভঙ্গিটিও সুন্দর। বাইশ জনের আলোচনা এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট উদ্‌ধৃতি থাকায় বক্তব্য সহজবোধ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে প্রবন্ধটি দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে সযত্নে রচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা আরও বিস্তৃত হলে ভালো হত।

ভবতোষ দত্ত

ভক্ত কবীর। শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে কবীরের আবির্ভাব একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যখন দুটি বিপরীতমুখী ধর্মের সংঘাতে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র আলোড়িত হচ্ছিল, ভারতের সেই দুর্দিনে যিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও নিঃসংশয় উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ধর্ম নিয়ে বিবাদ চরম মূর্খতা, ধর্ম কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতিতে আবদ্ধ নয়, সকল ধর্মের ভিত্তি ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম ও উচ্চ নৈতিক আদর্শই ধর্মপথের একমাত্র পাথেয়, এখানে হিন্দু ও মুসলমানে কোনো প্রভেদ নেই— আল্লা ও ভগবানে, রাম ও রহিমে, কোরান ও পুরাণে, মক্কা ও কাশীতে, কাবা ও কৈলাসে কোনো পার্থক্য নেই— সেই কবীর নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের অবহেলিত-সম্প্রদায়ের একটি লোক। কবীরের এই বাণী মানবহৃদয়ের চিরন্তন বাণী— তাই ভারতের ধর্মের ইতিহাসে কবীর-ধর্মের এক অভিনব গৌরব আছে।

ভারতবর্ষে জীবনের সঙ্গে ধর্মের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। জীবন থেকেই ধর্মের উদ্‌ভব হয়েছে এবং জীবনের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে ধর্ম যুগে যুগে নানা রূপান্তর লাভ করেছে। এই যে অসাম্প্রদায়িক, সকল ধর্মের মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবীর-ধর্ম, এও জীবনের তাগিদেই উদ্‌ভূত হয়েছিল। কবীরের আবির্ভাবকালের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এইরূপ একটি ধর্মের প্রয়োজন ছিল। এই ধর্ম সমসাময়িক জীবন থেকেই উদ্‌ভূত হয়েছিল। এতদিন ভক্তিধর্ম সমাজের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ স্তরের লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং ভক্তিমার্গীদের জাতিবিচার ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যাদিজ্ঞানও লোপ পায় নি। রামানন্দই প্রথম ঘোষণা করলেন— ব্রাহ্মণ-শূদ্র উচ্চ-নীচ জাতির বিচার নিরর্থক, বিষ্ণুর ভক্তেরা সবাই এক— সকলেই বৈষ্ণব, তাদের মধ্যে আহারাদির বাছ-বিচার অবাঞ্ছনীয়— সকল ভক্তই এক। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের মধ্য থেকে তাঁর শিষ্য গ্রহণ করলেন— পিপা রাজপুত, কবীর মুসলমান জোলা, সেনা নাপিত, ধনা জাঠ কৃষক, রুইদাস মুচি, পদ্মাবতী একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। এই শিষ্যদের নিয়ে ভারতের নানা স্থান ঘুরে তাঁর মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি বিষ্ণু নারায়ণ বা কৃষ্ণের স্থলে রামকেই পরমদেবতারূপে বেশি প্রচার করেছেন। তাঁরই প্রচারণে সমগ্র উত্তর-ভারতে রাম-পূজা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। রামানন্দের এই ভক্তিবাদ-প্রচারের প্রধান বাহন ছিল দেশীয় ভাষা। পূর্বের বৈষ্ণবাচার্যগণের যুক্তি-তর্ক-প্রচারণ সবই গ্রথিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়, রামানন্দ দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচার করে ভক্তিবাদকে জনসাধারণের কাছে একান্ত গ্রহণীয় করে তুললেন। রামানন্দ আচার্যগণ-প্রচারিত ভক্তিধর্মের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করলেন।

এই সময়েই কবীরের উদ্‌ভব ও তাঁর বাণী-প্রচার। কবীর রামানন্দের শিষ্য বলে কথিত। যে মূল বিষয়টি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান একেবারেই মিলতে পারছিল না সেই মূর্তিপূজা-সমস্যা কবীর সমাধান করলেন। এক ভগবান সত্য— তিনি রাম হরি গোবিন্দ নারায়ণ আল্লা খোদা সবই। যে-নামেই যে ডাকুক, সকলেই সেই এক ভগবানকে ডাকছে। ভগবান কোনো মূর্তিতে আবদ্ধ নন। তিনি সকলের— সকল নামের উপলক্ষ্য। কেবল হৃদয়ের একান্ত ভক্তি ও আত্মনিবেদনে তাঁকে পাওয়া যায়— কোনো আচার-অনুষ্ঠানে নয়। কবীর সর্বপ্রকার মূর্তিপূজা ও অবতারবাদ অস্বীকার করলেন। কবীরের এই

নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ অনেকখানি কমিয়ে ফেলল, দুই সম্প্রদায় যত দূর সম্ভব পরস্পরের নিকটবর্তী হল। একই দেশে বৎসরের পর বৎসর বাস করার জন্যে এবং নবদীক্ষিত মুসলমান সমাজের সকলেই হিন্দু হওয়ায় পূর্বসংস্কারের প্রভাববশে এবং কিছু পরিমাণ সুফী-প্রভাবের কারণেও কবীরের আগে থেকেই উৎকট বিদ্বেষ কতকটা প্রশমিত হয়ে আসছিল, এই সময় কবীর উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সর্বপ্রধান বাধা অপসারিত করলেন এবং তাঁরই প্রভাবে ভারতের ধর্মজীবনে এক নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হল।

সকল ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর -বর্জিত যে মূল সত্য যে ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেম, তাকেই কবীর অনুসরণ করেছেন তাঁর জীবনে এবং তারই জয়গান করেছেন। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্জাবের নানক (১৪৬৯), দাদূ-পন্থের প্রতিষ্ঠাতা আমেদাবাদের দাদূ (১৫৪৪), সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যার জগজীবন রাম (১৬৬০), সাধ্-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বীর্‌ভান (১৬৫৮), মালবের বাবা লাল, গাজীপুরের শিবনারায়ণ প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারকগণ কবীরের ভাব আদর্শ ও নীতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগে উত্তরপশ্চিম-ভারতের ধর্মের নবজাগরণের মূল অনুপ্রেরণার উৎসই কবীর।

দুঃখের বিষয়, এই যুগান্তকারী ধর্মসংস্কারকের জন্ম বংশপরিচয় ব্যক্তিগত জীবনের কার্যাবলীর কোনো ঐতিহাসিক-তথ্য-প্রতিষ্ঠিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সবটাই কিংবদন্তীভিত্তিক হওয়ায় বিভিন্ন মতের উদ্‌ভব হয়েছে। তবে বিভিন্ন মত ও নানা উল্লেখ বিচার করে এইটুকু সংগতভাবে অনুমান করা যায় যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মুসলমান জোলার ঘরে জন্মেছিলেন বা লালিত-পালিত হয়েছিলেন, নিজে বস্ত্র বয়ন করতেন, রামানন্দের শিষ্যও হতে পারেন, তাঁর হিন্দু ও মুসলমান অনেক শিষ্য ছিল এবং তিনি এমনই অসাম্প্রদায়িক সাধুব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু শিষ্যেরা তাঁকে হিন্দু বলে এবং মুসলমান শিষ্যেরা তাঁকে মুসলমান বলে দাবি করেছিল।

কবীর সম্বন্ধে একটি বিষয়ের সংগত মীমাংসা এখন পর্যন্তও হয়নি। তাঁর বিপুলায়তন সাহিত্যের নানা স্থানে যোগের কথার উল্লেখ আছে। ভক্তিমার্গ যোগমার্গ থেকে পৃথক এবং উভয় পথের সাধকের করণীয়ও পৃথক। কবীর ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়েও কেন যোগ অবলম্বন করতেন, তার নিঃসংশয় কারণ নির্দেশ করা যায় না। কবীরের যোগের স্বরূপনির্ণয় এই আলোচনার পরিসরে সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি বলা যায়, তাঁর যোগ হঠযোগের পর্যায়ভুক্ত। মনে হয়, তিনি যোগপথকে ভক্তিপথের সহায়কভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। যোগের দ্বারা চিত্তস্থৈর্যসাধন দেহশোধন প্রভৃতি করে তিনি একান্তভাবে ভগবৎ-মুখী হয়েছিলেন। তাঁর কর্ম ও জ্ঞান কেবল তাঁর ঐকান্তিক ভক্তিকেই পরিপুষ্ট করেছে।

ডক্টর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রভৃতি লেখক জোলার ঘরে কবীরের জন্ম বা লালিত-পালিত হওয়া, কবীরের যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। এই জোলারা পূর্বে ছিল নাথধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে হঠযোগসাধনার প্রচলন ছিল। কবীর যে-পরিবারে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন, তারা মাত্র এক-আধ পুরুষ আগে মুসলমান হয়েছে এবং পূর্বেকার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার এবং আচার-অনুষ্ঠান পুরোমাত্রায় তাদের মধ্যে বজায় ছিল।

এ অনুমান অসংগত নয়। জোলা-সম্প্রদায় আদিতে ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম থেকে শৈবধর্মপ্রভাবে নাথধর্মের উদ্‌ভব হয়। নাথধর্মে শুদ্ধ হঠযোগের ক্রিয়াই মূল সাধনা। উত্তরপশ্চিম-

ভারতের জোলা-সম্প্রদায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে ছিল নাথধর্মাবলম্বী। বাংলার জোলা-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কিন্তু বরাবরই ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও অনেকে এই সহজ-সাধনা ত্যাগ করেননি। বাংলার বিভিন্ন জেলার জোলা-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি বাউল-ফকিরের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। কবীরের জন্মান্তর ও কর্মবাদে বিশ্বাসও এই সূত্র থেকে আসতে পারে বলে মনে হয়। অবশ্য সুফী-প্রভাবও তাঁর উপর ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার দাস কবীর সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ বাঙালী পাঠক এই গ্রন্থপাঠে কবীরের জীবন ও বাণীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারবেন। এই গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ এর অনুবাদগুলি। অনুবাদগুলি সর্বত্র মূলানুগ হয়েও ভাষার লালিত্যে ও সাবলীল প্রবাহে একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এদিক দিয়ে অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। বিখ্যাত ফরাসি লেখক Anatole Franceএর অনুবাদ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে—Translations, like women, are either faithful or beautiful, rarely both। উপেন্দ্রবাবু এই faithful ও beautifulএর সমন্বয় সাধন করেছেন। আমরা তাঁকে কবীরের আরো কয়েক শত পদের এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি, তাতে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ সমৃদ্ধি বাড়বে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদের সংখ্যা সহজেই বাড়ানো যেতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বারো মাসের ছড়া। শ্রীবুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্, কলিকাতা। তিন টাকা।
কথার কথা। শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্বাক্ষর, কলিকাতা। দেড় টাকা।
গল্প আর গল্প। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি. কলিকাতা। দুই টাকা।
আলিভুলির দেশে। শ্রীসুখলতা রাও। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি.। দুই টাকা।
গল্পময় ভারত। শ্রীসুশীল জানা। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি.। চার টাকা।
অথ ভারত-কথকতা। কথক ঠাকুর। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি,। নয় সিকা।
জগন্নাথের খেয়ালখাতা। জগন্নাথ পণ্ডিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। আড়াই টাকা।
সুন্দরবনে সাত বৎসর। ভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিটি বুক সোসাইটি, কলিকাতা। সাড়ে তিন টাকা।

এই আটখানি বই দেখলেই বোঝা যায় আজকাল শিশুসাহিত্যের ব্যাপারে প্রকাশকরা আগেকার চেয়ে অনেক দায়িত্ব-সচেতন হয়েছেন। সব বইগুলিরই কাগজ ছাপা বাঁধাই ছবি সজ্জা ইত্যাদি প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য জগন্নাথের খেয়ালখাতা বইখানির টাইপ আর-একটু বড় হলে ছেলেদের পড়বার সুবিধা হত। সুন্দরবনে সাত বৎসরের কাগজ ও বাঁধাই এত ভালো যে তার তুলনায় এর দাম কমই ধরা হয়েছে বলতে হবে। অন্যান্য বইগুলিরও দাম যুক্তিযুক্ত।

ছখানি বইই গল্পসংকলন, শুধু প্রথম দুখানি তা নয়। তাদের *একটি* ছড়ার বই, আর-*একটি* ভাষা ও শব্দরহস্য সম্বন্ধে।

বারো মাসের ছড়ার কবিতাগুলির প্রধান গুণ এই যে, তারা কোথাও ছন্দ বা ভঙ্গির টানে স্বতঃস্ফূর্ত দোলনকে অতিক্রম করে নি। একদিকে আছে ঘর— মা বাবা দাদা দিদি, তার পর ছোকানু প্রভৃতি চরিত্রের কথায় কাজে সমস্ত মন কেড়ে-রাখা; আর, আর-একদিকে প্রকৃতির সেইসব খেলা যা গৃহস্থের গার্হস্থ্যের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি মারে, আসর জমাতে চায়। এই দুই মিলিয়ে যেসব নাট্যমুহূর্ত বা স্বপ্নসম্ভোগ— যেমন রামধনু দেখার উত্তেজনা বা নদীস্বপ্ন আকাশস্বপ্ন পরীর স্বপ্নের মধ্যে মনকে সহজ আনন্দে মেলে দিতে পারা— এই নিয়েই বইখানির অধিকাংশ কবিতা। ঘরোয়া ছবি ও কণ্ঠ কবিতাগুলিকে উধাও হয়ে উড়ে যেতে না দিয়ে ঘরের সীমানার মধ্যে ধরে রেখেছে। তার ফলে কবিতা হয়েছে ঘরোয়া, কিন্তু ঘরও হয়েছে খানিকটা কবিতার পাগলামির হাওয়ায় উতল। তাই রামধনু দেখতে

পেয়ালা ফুরোলে মা বাবা গেলেন,
ন'দি খোঁপা ঠিক করে।

এ ছাড়া আছে ব্লেকের কবিতার অনুবাদ, একটা হাসির গল্প, দু-একটি ব্যঙ্গ কবিতা— যার রস সুকুমার রায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়— এবং জোনাকি নামে একটি ছন্দের কৌতুকনৃত্যের কবিতা। যেসব ছেলেমেয়ে অযথা-উত্তেজক বই পড়ে মনের সূক্ষ্মতা নষ্ট হতে দেয় নি, তারা এই বই ভালোবাসবে।

আগেকার দিনের মত ব্যাকরণ আর অভিধানের সাহায্যে ভাষা শেখার দিন আর নেই। এখন ভাষাকে দেখা হয় মানুষের মন আর জীবনের জীবন্ত প্রতিরূপ হিসাবে। ব্যাকরণের নিয়মের নিগড়ে ভাষাকে না বেঁধে ভাষাকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে তার রীতিনীতি হালচাল চিনে ও মেনে নেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করা হয়। তার ফলে ভাষার তত্ত্বগুলির বিভীষিকা গেছে কমে, সেগুলি হয়ে উঠেছে রহস্যময়, চিত্তাকর্ষক। বিদেশী ভাষায় এই রকমের প্রথমপরিচয়-গ্রন্থ আজকাল অনেক হয়েছে। বাংলায় অতি সরস ভঙ্গিতে ভাষাতত্ত্বের এই প্রবেশক গ্রন্থ লেখায় ছেলেদের মন এই দিকে জাগিয়ে তোলবার সাহায্য হবে।

গল্প আর গল্পে অনেক ধরণের গল্প একত্র হয়েছে। রাক্ষস দৈত্য প্রভৃতির গল্পে ব্যঙ্গের সুর মিশিয়ে তার মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনের নানা দিকে সকৌতুক কটাক্ষপাতের দৃষ্টান্ত— রূপকথার কেলেঙ্কারি, কুরুক্ষেত্রে ভজা। 'কালরাক্ষস কোথায় থাকে'তে লেগেছে সূক্ষ্ম রহস্য ও আদর্শের রেশ। দুটি দু ধরণের ছেলের স্টাডি আছে— তাদের একজন অত্যন্ত সত্যবাদী, আর-একজন ভাবী বৈজ্ঞানিক। আকাশের আতঙ্ক গল্পে আছে বৈজ্ঞানিক রোমান্স— যাতে প্রেমেনবাবু সিদ্ধহস্ত। রতন পাঙ্গালীর হাতী ধরা ও পোষ মানানোর গল্পে ঐ বিষয়ে এমন অনেক তথ্য আছে যা অনেকের কাছেই বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হবে। আর, তা ছাড়া গল্পের স্বর্গে কল্পনাকে একেবারে বিনাশর্তে মুক্তিদান করায় যা ঘটবার তাই ঘটেছে।

এখন, পাঠকপাঠিকার মধ্যে অনেকেই বিশেষ পছন্দ করবে সেই রাক্ষসটাকে— যে হাউ মাউ খাঁউ করে কেঁদে ফেলে বললে, 'ধর্মাবতার, আমি নেহাত মুখ্‌খু সাদাসিদে রাক্ষস'। অনেকে রুদ্ধশ্বাসে পড়বে রতন পাঙ্গালী, আর সেই ব্যাপার— সেই 'আকাশের আতঙ্ক'।

রূপকথার দেশে, স্বপ্নের রাজ্যে অতি সহজ অতি অনায়াস বিচরণ সুখলতা রাওয়ের 'আলিভুলির দেশে'। বইখানির মধ্যে নমু নামে মেয়েটি যেমন তার জেগে-থাকার পৃথিবী আর দিবাস্বপ্নের দেশের তফাত বুঝে

উঠতে পারে না, যখন-তখন চলে যায় আলিভুলির দেশে— যেন ঠিক চৌকাঠের এপার আর ওপার— সুখলতা রাও নিজেও ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দে ছেলেমেয়েদের হাসিকান্না খেলাধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন— জোনাকি, পঞ্চভূত, রত্নের রানী রত্না, চাঁদের মেয়ে, আর আলিভুলি ও নানা খুচরো পরী তো আছেই— এদের সকলের জীবন। আর, এর ফলে শিশুজীবনের সরল অনুভূতির মধ্যে ঝরে পড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেতনা, সুন্দর আদর্শ ও আবেগের ঐশ্বর্য। গল্প বলার অকৃত্রিম ভঙ্গিটি মুহূর্তের জন্যেও নষ্ট হয় নি, তাই অনেকগুলি গল্পে উপদেশ বা শিক্ষার মত কিছু উপাদান থাকলেও গল্পের মাধুর্য তার জন্যে কিছুমাত্র কমে নি। কয়েকটি গল্পে আছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে কল্পনা। শেষের দিকে গল্পগুলিতে শিশুমন ও তার চারপাশের সামাজিক জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখানেও গল্প বলার ভঙ্গি একই রকম। সে ভঙ্গির সামনে বাদানুবাদ দাঁড়াতে পারে না; যেমন অনাড়ম্বর এই আনন্দের নিমন্ত্রণ, তেমনি বিনা ওজরে তা গ্রহণ করতেও হয়।

গল্পময় ভারত ও অথ ভারত-কথকতা বই দুখানির নাম থেকেই বোঝা যায় সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে যে সাহিত্যিক সম্পদ্ সঞ্চিত হয়েছে তার থেকে কতকগুলি কাহিনী বেছে নিয়েই এই সংকলন। জাতকের গল্প দুটি বইয়েই আছে। কিন্তু গল্পময় ভারতের অধিকাংশ গল্প নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। বেদ-উপনিষদের গল্প কিছু-কিছু আছে; কিন্তু বেশির ভাগ গল্প বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলির আখ্যানভাগের অনুলিখন। আর আছে আধুনিক কালের পূর্ববঙ্গের মাণিকচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী। দ্বিতীয় বইটিতে জাতকের গল্প ছাড়া আছে বাংলা ও আসামের কয়েকটি উপকথা। দুটি বইয়েই পুরোনো কাহিনীকে কল্পনার সাহায্যে সরস ও সজীব ক'রে তোলার চেষ্টা অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছে। ছেলেমেয়েরা এই দুখানি বইই যে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

জগন্নাথের খেয়ালখাতা খুব ছোটদের জন্যে নয়। এর রস গ্রহণ করতে পারবে চোদ্দ পনেরো বা তারও চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা। এর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশ পত্রিকায়, তখন সুকুমার রায় তার ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবিটিও এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থানী জমাদারের মুখে শোনা কাহিনীগুলিই এই বইয়ের সম্পদ্। একদিকে বাড়িতে ছেলেদের ও তাদের বড়দা ও ভুলুবাবুর মুখে পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপার— যেমন ফুটবল খেলা, শিকার করা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি সব-কিছু সম্বন্ধেই টীকাটিপ্পনী; আর, অপর দিকে জমাদার সাহেবের অতি চোস্ত্ ইডিয়মেটিক হিন্দী বুলি ও চমৎকার গল্প— যা ক্লাসিক হয়ে থাকবার যোগ্য। মেঘরাজ আনসূয়া তো আমাদের দেশের *Taming of the Shrew*। ভৌতিক ব্যাপারও কি প্রচুর টেকনিকাল তথ্যে পূর্ণ। মোট কথা, এই বইএর ভাষা, এর গল্পের বিষয়, রহস্যের দৌড়— সবই একে সাবালক পাঠকেরই পক্ষে উপযুক্ত করেছে, ছেলেমেয়েদের জন্যে ততটা নয়। বইটি রসিক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

সুন্দরবনে সাত বৎসর বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে সন্দেহ নেই। এককালে বিখ্যাত শিশুপত্রিকা 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক এই গল্পটির লেখক, কিন্তু এর শেষ কয়েক অধ্যায় তিনি লিখে যেতে পারেন নি। গল্পটি শেষ ক'রে দেবার ভার দেওয়া হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুই লেখকের হাতের প্রভাব যে একেবারে আলাদা করা যায় না তা নয়। বিভূতিবাবুর হাতে পড়ে গল্পের কেন্দ্রচরিত্র সেই হারিয়ে-

যাওয়া কিশোর ছেলে নীলু হয়ে উঠেছে ভাবুক, যা সে আগে ছিল না ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার দৃষ্টি তার হঠাৎ খুলে গিয়েছে। তা হোক, বেমানান হয় নি। আর, দুই লেখকেরই অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও অরণ্যরহস্য সম্বন্ধে শুধু প্রীতি নয়, সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা থাকায় গল্পের সেই দিকটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনকে আকর্ষণ ক'রে রাখে। পাতায় পাতায় সুন্দরবনের জন্তুদের বিচিত্র চরিত্রের বিবরণ ও ছবি, আর নীলু ও মগদস্যুদলের এমন একটি গল্প যাতে আজকালকার রহস্য-রোমান্সের অস্বাভাবিকতা কোথাও আরোপ করা হয় নি। পড়লে মনে হয় সব সত্যিই ঠিক এ রকম হয়েছে। আর শেষটা 'পথের পাঁচালী' -লেখকের করস্পর্শেরও একটা আকর্ষণ আছে বৈ-কি। এ বই সব ছেলেমেয়েই পড়বে আশা করি।

সুনীলচন্দ্র সরকার

STUDIES IN THE BENGAL RENAISSANCE : Bipin Chandra Pal Birth Centenary Commemoration Volume : Edited by Sri Atul Chandra Gupta. National Council of Education, Jadavpur, Calcutta-32. Rs. 15·00

THE DAYS OF JOHN COMPANY : Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832 : Compiled and Edited by Anil Chandra Das Gupta. B. G. Press, Calcutta. Rs. 11·00

HISTORY OF THE INDIAN ASSOCIATION : Jogesh Chandra Bagal. Indian Association, Calcutta. Rs. 7·50

WOMEN'S EDUCATION IN EASTERN INDIA, THE FIRST PHASE : Jogesh Chandra Bagal. World Press, Calcutta. Rs 7·50

বাংলার নব্যসংস্কৃতি। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১·৪০ ন. প.

কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা। ৫·০০ ন. প.

বিদ্যাসাগর-পরিচয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ২·০০ ন. প.

বরণীয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি., কলিকাতা। ৫·০০ ন. প.

জাগৃতি ও জাতীয়তা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। ৪·৫০ ন. প.

মুক্তির সন্ধানে ভারত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা। ১০·০০ ন. প.

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান। শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা। ৫·০০ ন. প.

বাংলার 'রেনেসাঁস'-আন্দোলনের উত্তরাধিকার উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত যাঁরা পারিপার্শ্বিক প্রাতিকূল্যের মধ্যে বহন করে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রগণ্য। জীবনের অপরাহ্ণে বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তা আধ্যাত্মিকতার আবরণে কতকটা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, স্বদেশীযুগে তার বলিষ্ঠতা তাঁকে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক ও কর্মনায়করূপে গড়ে
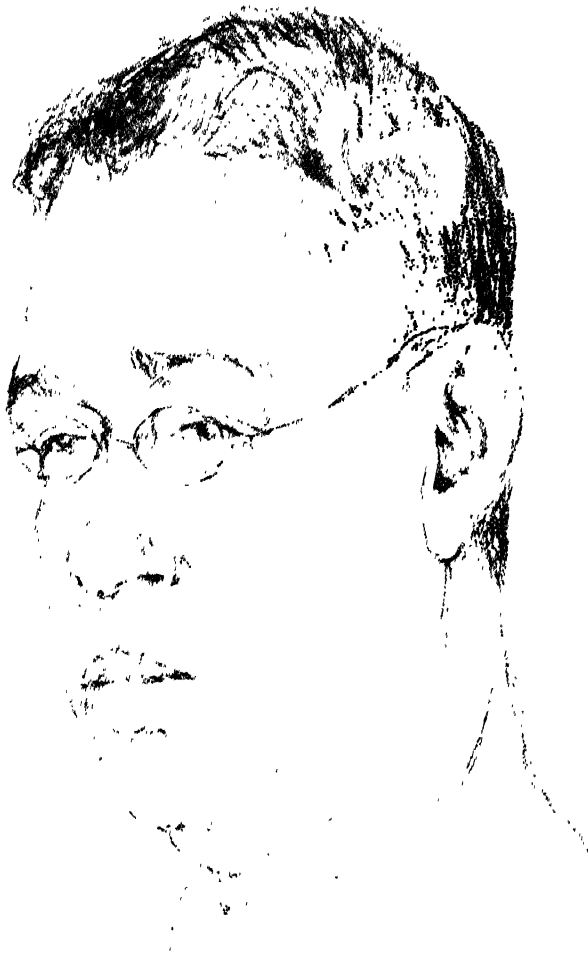
শ্রী বিপিন চন্দ্র পাল

৬ই আশ্বিন – ১৩২৪

বিপিনচন্দ্র পাল

শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

তুলেছিল। তাঁর জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে বাংলার বিদ্বজ্জনেরা *Studies in the Bengal Renaissance* নামে সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির যোগ্য তর্পণ করেছেন।

আঠার ও উনিশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ধীরে ধীরে বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করার ফলে ভারত-ইয়োরোপের ভাবধারার সংঘাত ও লেনদেনের সুযোগ ঘটে। ঐতিহাসিক কারণেই সুযোগ প্রশস্ত হয় বাংলাদেশে। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও জীবনবোধের সাহচর্যের ফলে বাংলার ধর্ম সমাজ রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যে প্রায়বিস্মৃত পুরাতনের সমীক্ষা ও নূতন আদর্শের আত্মপ্রতিষ্ঠার আলোড়ন শুরু হয়, তাকেই আমরা ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অনুকরণে 'রেনেসাঁস' বলে থাকি। কিন্তু ইয়োরোপের ও ভারতের বা বাংলাদেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক অবস্থার পারস্পরিক সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে কতখানি আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগৃতি-আন্দোলনকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া যায় তা নিয়ে অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। এখানে সে-তর্কের অবতারণা করে লাভ নেই। পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের সামগ্রিক গভীরতা অথবা দৃঢ়মূল আত্মস্থতা, কোনোটাই এ দেশে ছিল না। রাজনৈতিক বশ্যতা ও মানসিক জড়ত্ব আমাদের নবজাগৃতি আন্দোলনের উপর অনুভূমিক (দেশগত) ও ঊর্ধ্বভূমিক (সামাজিক শ্রেণীগত) উভয় রকমের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল। অর্থাৎ এ দেশের যাবতীয় নবজাগরণ প্রধানতঃ শহরকেন্দ্রিক ও বিদ্বান-বিত্তবান মধ্যশ্রেণীবদ্ধ। তার বাইরে নবচেতনার সূর্য মেঘচুম্বী প্রথা-সংস্কারের দেয়াল ভেদ করে রশ্মি ছড়াতে পারে নি। কিন্তু এত সব সীমা-স্ববিরোধ সত্ত্বেও উনিশ শতকের বাংলার চিন্তালোড়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনকে 'রেনেসাঁস' আখ্যা দিলে বিশেষ অতিশয়োক্তি হয় বলে মনে হয় না। আলোচ্য সংকলনের ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে তাঁর যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য নিবেদন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ৪১ জন লেখক নানাদিক থেকে বাংলার রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। সকলের দৃষ্টিকোণ যে অভিন্ন তা নয়, বরং রচনাগুণের ভিন্নতা তার চেয়ে অনেক বেশি। মতের স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে শ্রীবিষ্ণু দে'র মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে রচনাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার রেনেসাঁসকে তিনি প্রধানতঃ 'অ্যাংলো-রেনেসাঁস' বলতে চেয়েছেন, এবং এই অবৈধ রেনেসাঁসের ব্যর্থতা মাইকেলের জীবন ও সাহিত্যসাধনার দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মত ও যুক্তি তর্কাতীত না হলেও অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। এই রচনাটি ছাড়া অন্যান্য কোনো রচনায় মূল বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র সুরের বিশেষ কোনো অনুরণন শোনা যায় না। অন্যান্য লেখকদের নিজস্ব মতামত থাকলেও হয়তো তাঁরা প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে এরকম তর্কসাপেক্ষ প্রসঙ্গ, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, উত্থাপন করতে চাননি।

সংকলনটির একটি বড় ত্রুটি হয়েছে এই যে আলোচ্য বিষয়গুলি অত্যধিক পরিমাণে খণ্ডিত হয়েছে এবং সেই খণ্ডগুলির যোগফলরূপে বাংলার নবজাগরণের একটি অখণ্ড রূপ পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে নি। স্বল্পপরিসরে অনেক গুরুবিষয়ের রচনায় লেখকের ভাববিস্তার ব্যাহত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অতি সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ উনিশ শতকের বিশাল ও জটিল আর্থনীতিক পশ্চাদ্‌ভূমির আলোচনা করেছেন। মাত্র সাত পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো বিশেষজ্ঞের পক্ষেই এ-বিষয়ের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। আরও বেশি জায়গার মধ্যে লেখককে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার সুযোগ দিলে বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। অবশ্য অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও,

উনিশ শতকী অর্থনীতির মূল ধারাগুলিকে তিনি সূত্রাকারে সুস্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ইতিবৃত্ত, অনেকেই জানেন, পর্ব থেকে পর্বান্তরে উত্থান-পতনের অসমতল পথে তরঙ্গিত হয়ে গেছে। বিস্তৃত দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার) এই ইতিবৃত্তের পরিচয় দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ছিল। তা না দিয়ে রামমোহন, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন যুগপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নাকারে আলোচিত হয়েছে। তাতে সংস্কারেতিহাস ও ব্যক্তিচরিত্র উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, এবং এই মূল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বিবরণের অভাবে আলোচ্য সংকলনের প্রকৃত ইতিহাস-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। এর মধ্যে উনিশ শতকের রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের ধারাটি কেবল সুষ্ঠুরূপে ফুটে উঠেছে সংকলনের ছটি অধ্যায়ের মধ্যে (১৩৯-২৫৭ পৃষ্ঠা)। এই ছটি অধ্যায় পর্বভেদে লিখেছেন যথাক্রমে শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীগোপাল হালদার। সমগ্র সংকলনের মধ্যে এই কয়েকটি রচনাই বর্তমান সমালোচকের কাছে সর্বাধিক সুবিন্যস্ত বলে মনে হয়েছে; এগুলির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের ও ভারতের জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্মেষের অখণ্ড চিত্রটিও প্রতিভাত হয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন দিক এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাগুলি সুলিখিত। খণ্ডিত হলেও এগুলির বিষয়োদ্‌ঘাটনে তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি, যতটা ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার বিষয়ে ঘটেছে। সংকলনের গোড়ায় বাংলার নবজাগরণের যে-কোনো দিক সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের নিজের একটি ইংরেজি রচনা উদ্‌ধৃত করে দিলে ভালো হত বলে মনে হয়।

জন কোম্পানির আমলের দিনগুলির বিবরণ আছে দ্বিতীয় গ্রন্থে। ১৮২৪ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে বিবরণের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৭৮৪, ৪ মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত 'গেজেট' ঠিক বর্তমানের সরকারী বিজ্ঞপ্তি-নিয়মকানুনের যথাযথ বিবরণ প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ দেশবিদেশের সংবাদও সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ পরিবেশিত হত। সেই সময়কার গেজেটের বিভিন্ন রচনায়, সংবাদে, সম্পাদকীয়তে, এমনকি নানারকমের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত, তদানীন্তন বাংলার সমাজচিত্র বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্বে তাই সিটন-কার (W. S. Seton-Carr) ও স্যাণ্ডিম্যান (Hugh Sandemann) গেজেটে প্রকাশিত রচনাদির নির্বাচিত সংকলন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত উপকরণ পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ১৮৩২ সাল পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রের মতন প্রকাশিত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের সংকলক স্যাণ্ডিম্যানের ইচ্ছা ছিল আরও এক খণ্ডে ১৮২৪-১৮৩২ সালের উপকরণ সংকলন করে কাজটি শেষ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই অসমাপ্ত কাজ দীর্ঘকাল অনুসন্ধানীদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকার পর শ্রীঅনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। কোনো আশু পুরস্কার বা অ্যাকাডেমিক সম্মানের মুখাপেক্ষী না হয়েও সংকলয়িতা উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি মূল্যবান অপরিহার্য আকরগ্রন্থ অনুরাগীদের উপহার দিয়েছেন, এজন্য তিনি বিদ্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

প্রধানতঃ রামমোহন ও ডিরোজীয়ানদের যুগের উপকরণই 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে আলোচ্য গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। নবযুগের বাংলার ইতিহাসে এই পর্বের গুরুত্ব যে কতখানি তা ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছাত্ররা বিলক্ষণ জানেন। তার আর্থনীতিক অবস্থা, ব্যাবসাবাণিজ্যের হাল, সমাজসংস্কার-আন্দোলন, নব্যশিক্ষার বিধিব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এত পর্যাপ্ত পরিমাণে সংকলয়িতা ন বছরের (১৮২৪-১৮৩২) পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার জীর্ণ ফাইল ঘেঁটে সংগ্রহ করেছেন যা দীর্ঘকাল গবেষকদের অনুসন্ধানের খোরাক যোগাবে। সংকলনে উদ্‌ধৃত বিভিন্ন সংবাদ, রচনা ও বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে তাৎকালিক বাঙালীসমাজের একটি চমৎকার চিত্র যে-কোনো শ্রমসহিষ্ণু পাঠকের চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে। কেবল বাঙালী-সমাজের নয়, ইংরেজ-সমাজের উপাদানগুলিও সম্পাদকের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায়নি। গেজেটের বিচিত্র তথ্যস্তূপ ঘেঁটে ঐতিহাসিকের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ আহরণে তিনি যে প্রখর ইতিহাসবোধ ও অসাধারণ শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয় তো বটেই, ভবিষ্যতের অনুরূপ কর্মীদের অনুসরণীয়।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজের নানাদিক নিয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল দীর্ঘকাল ধরে একনিষ্ঠভাবে গবেষণা করছেন। আলোচ্য তাঁর আটখানি বইয়ের মধ্যে তার ফলাফলের পরিচয় অনেকটা পাওয়া যায়। ভারত-সভার ইতিহাস (১৮৭৬-১৯৫১) ও পূর্বভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বই দুখানি ইংরেজিতে রচিত। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিবেশ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন : "· ·বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিন জনে [শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয়বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল।· ·'ভারত-সভা' স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে।· ·ইণ্ডিয়ান লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই"— আত্মচরিত, ১৩২৫, ২১৭-১৯ পৃষ্ঠা। সহজ ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয় এখানে ভারত-সভার উৎপত্তির সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমির উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত দলাদলির কথা যা তিনি বলেছেন তা আপাততঃ আমাদের আলোচ্য নয় বলে সেই অংশটুকু উদ্‌ধৃতি থেকে বর্জন করা হল। ভারত-সভার আদিপর্বের ইতিহাস যোগেশবাবু তাঁর গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তথ্যপ্রমাণসহ তিনি দেখিয়েছেন যে ভারত-সভার আগে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপিত হয়েছিল। ভারত-সভা স্থাপিত হওয়ার পরে লীগের স্বতন্ত্র সত্তা ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। ভারত-সভা এ দেশের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে কিভাবে জাতীয় চেতনা বিস্তারে ও জনকল্যাণকর্মে সাহায্য করেছে, গ্রন্থকার সে বিষয়ে সভার রিপোর্ট ও অন্যান্য বিবরণাদি থেকে সংগৃহীত

পর্যাপ্ত তথ্যসহ আলোচনা করেছেন। 'পূর্বভারতে স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ে ইংরেজি-গ্রন্থে লেখক ১৮১৯ সালের 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' থেকে আরম্ভ করে 'বেথুন' স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। চ্যাপম্যান, লাসিংটন, শার্প ও রিচি প্রভৃতির অধুনা-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই আদিপর্বের ইতিহাস সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। স্বল্পপরিসরে এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি প্রামাণিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করে লেখক কৌতূহলীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'বাংলার নব্যসংস্কৃতি' বইখানিতে উনিশ শতকের বিভিন্ন সভাসমিতির নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা প্রভৃতি প্রায় কুড়ি-বাইশটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূলক সভা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু। আলোচনা যতদূর সম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ।

'কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র' বইখানিতে লেখক শহরের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান, প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি ইত্যাদির যথাসম্ভব বিবরণ সন্নিবেশ করেছেন। কলকাতা শহরের নানারকমের বিচিত্র কাহিনীর প্রতি বহু লেখক ও পাঠক সম্প্রতি যে বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি কলকাতার কোনো ঐতিহাসিক পরিচায়কগ্রন্থ বাংলাভাষায় বা ইংরেজিতে নেই বললেই হয়, রেভারেণ্ড ফার্মিঙ্গার ও সুরাবর্দি সাহেবের দুখানি অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি বই ছাড়া। বাংলাভাষায় রচিত আলোচ্য বইখানি এদিক দিয়ে কৌতূহলীদের অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তি করতে সাহায্য করবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত লেখকের বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালা 'বিদ্যাসাগর-পরিচয়' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকালীন বাংলাদেশের অবস্থা, তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস, সাহিত্যসাধনা ও সমাজহিত-প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে লেখক যে তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তাতে সাধারণ পাঠক ও অনুসন্ধানী উভয়েই উপকৃত হবেন।

'বরণীয়' বইখানিতে এমন কয়েকজন সুখ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তির জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে যাঁরা লেখকের জীবনে নানাদিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন। লেখকের 'গুরুমহাশয়' থেকে আরম্ভ করে 'পিতৃদেব' পর্যন্ত ৩১ জন 'বাঙালী'র জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বনামধন্যদের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু শিক্ষক নিবারণচন্দ্র বৈদ্য, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বিশ্বাস বা নিশিকান্তের মা-র কথা কারও জানবার কথা নয়। দেশের বহমান সমাজ-জীবনে সকলশ্রেণীর মানুষের অল্পবিস্তর দান আছে। যাঁদের দান বিস্তর তাঁরা সমাজে সুপরিচিত, আর যাঁদের দান অল্প তাঁরা অজ্ঞাত। সমাজের ইতিহাসরচয়িতার কাছে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, খ্যাত ও অখ্যাত, সকলেরই উপাদানমর্যাদা সমান। বর্তমান গ্রন্থের চরিতরচনাগুলি কতকটা লেখকের আত্মজীবনমুখী হলেও সামাজিক রচনা হিসেবে পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য মনে হবে।

'জাগৃতি ও জাতীয়তা' গ্রন্থের প্রথম বিভাগে জাগৃতি-বিষয়ে এবং দ্বিতীয় বিভাগে জাতীয়তা-বিষয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। প্রথম বিভাগে পাশ্চাত্য আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতে বাংলাদেশে যে চিন্তালোড়নের সৃষ্টি হয় তার বিবরণ দিয়ে, নূতন সংস্কৃতচর্চা, বাংলাশিক্ষা ও বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্যে কিভাবে জাগরণের

গতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের চেয়ে তথ্যসন্নিবেশে তাঁর অধিকতর নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে, এবং জাতীয়তা বিভাগের রচনাগুলিতেও তা অক্ষুন্ন রয়েছে দেখা যায়। অবশ্য এই গ্রন্থের 'জাতীয়তা' অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ভূমিকা-স্বরূপ। যাঁরা জাতীয়তার বিস্তৃত ইতিহাসপাঠে ইচ্ছুক তাঁরা লেখকের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' অবশ্য পাঠ করবেন। ১৩৪৭ সনে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্প্রতি সংশোধিত ও বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কংগ্রেস-পূর্ব যুগ ও কংগ্রেস-যুগ, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বইখানিতে জাতীয়তার ইতিহাস বিভক্ত। রামমোহন থেকে ভারত-সভা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত বিভিন্ন পর্বে বিবৃত করে লেখক কংগ্রেস-যুগে পৌঁছেছেন, এবং স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তারে সাহায্য করে কংগ্রেস কিভাবে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে, লেখক সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যায়ক্রমে রচনা করেছেন। খণ্ডিত ভারতের কথাও বাদ দেওয়া হয় নি। এদিক দিয়ে বাংলা ভাষায় জাতীয় আন্দোলনের একখানি ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য। অবশ্য যোগেশবাবুর জাতীয়তার ইতিবৃত্ত আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ এ দেশের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাদেশিকতাবোধ ও স্বার্থের বিকাশ-বিবরণের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। তার সঙ্গে গণ-আন্দোলনের ধারাটির বিচার-বিশ্লেষণ করে, জাতীয় চেতনা বিস্তারে তার দানের কথাটুকুও যদি তিনি আলোচনা করতেন তাহলে গ্রন্থখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ হত। অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে *Peasant Revolution in Bengal* (Calcutta, 1953) গ্রন্থে এ বিষয়ে লেখক আলোচনা করেছেন।

'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' নাম থেকেই বোঝা যায় আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাংলা 'সাহিত্যে' বিজ্ঞান আলোচনার বিবরণ, বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার পূর্ণ ইতিহাস নয়। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত রবার্ট মে-র 'অঙ্কপুস্তক' বাংলাভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক মুদ্রিত বই। এই সময় থেকে, অর্থাৎ হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে, বর্তমানকালের জগদানন্দ রায়, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পর্যন্ত শতাধিক বৎসরের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ইতিহাসের ধারাকে বিভক্ত করা হয়েছে তিনটি পর্বে— হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম পর্ব, অক্ষয়কুমার থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব এবং রামেন্দ্রসুন্দর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। পরিশিষ্টে আলোচিত হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান কৃষিবিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি 'কারিগরী বিজ্ঞান'। প্রত্যেক পর্বের বিবরণে লেখক সযত্নে বিজ্ঞান-সাহিত্যের রচয়িতাদের রচনাবলীর যথাসম্ভব বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন এবং তাৎকালিক পত্রিকার বিজ্ঞান-অনুশীলনের কাহিনীও পর্যাপ্ত উদ্ধৃতিসহ বিবৃত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানসাধনার ক্রমিক ইতিবৃত্ত এইভাবে পূর্বে কেউ রচনা করার চেষ্টা করেছেন বলে জানি না সেদিক দিয়ে লেখক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ-পথে প্রথম দুঃসাহসী অভিযাত্রীর সাধুবাদ দাবি করতে পারেন।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের পর্বভেদ-প্রসঙ্গে লেখক যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু কোনো ইতিহাসেরই কালানুক্রমিক পর্বভেদ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত নয়, কতকটা ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক বলা চলে। এক-একটি পর্বের ছেদ না টানলে রচনার শৃঙ্খলা ক্ষুন্ন

হবার সম্ভাবনা থাকে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে লেখকের পর্বভেদ তর্কসাপেক্ষ হলেও, অধিকার-বহির্ভূত নয়। প্রধানতঃ পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানকেই প্রকৃত বিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত করেছেন লেখক, এবং সংগত কারণেই করেছেন। আয়ুর্বেদ ফলিত-জ্যোতিষ ও হোমিয়োপ্যাথিকে বাদ দেওয়া আদৌ অসংগত হয়নি। বিষয়ালোচনাপ্রসঙ্গে কেবল একটি কথা মনে হয়েছে এই যে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে হঠাৎ যেভাবে বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্‌ভব দেখানো হয়েছে সেটা বোধ হয় কতকটা 'অবৈজ্ঞানিক'। সমাজে কোনো বিষয়েরই উদ্‌ভব হঠাৎ শূন্যতা থেকে হয় না, বিজ্ঞানের তো হতেই পারে না। বিজ্ঞান-অনুশীলনের সূত্রপাত এ দেশে ১৭৮৪ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে হয়েছে বলাই বোধ করি সংগত, এবং এশিয়াটিক সোসাইটি যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল সেটাও বাংলার গৌরব নয় শুধু, ভারতের গৌরব, সারা এশিয়ার গৌরব। তার প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছিল, "enquiry into the history and antiquities, arts, sciences and literature of Asia"। উইলিয়ম জোন্স এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature"— এই কথাই তো বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। আরও বিশদভাবে তিনি বলেছিলেন, "You will examine their improvements and methods in arithmetic and geometry—in trigonometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics."। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার বত্রিশ বছর আগেকার কথা। বিজ্ঞানের অনুশীলন কতদূর পর্যন্ত এই সময়ে হয়েছিল তার বিস্তারিত পরিচয় *Asiatick Researches* এবং সোসাইটির Journal ও Proceedings-এর রচনাবলীর Indexএর মধ্যেই পাওয়া যাবে। অবশ্য সবই ইংরেজিতে লেখা এবং ইয়োরোপীয়দের লেখা, কিন্তু তাতে কি? বাংলায় বিজ্ঞানের বইও তো প্রথমে ইংরেজরা লিখেছিলেন। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্‌ভব ও বিজ্ঞানচর্চার অনুশীলনের ক্ষেত্র তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন প্রধানতঃ এ দেশের এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্বের অবতারণার পূর্বে লেখক যদি এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'উদ্‌যোগপর্ব' বা ঐ জাতীয় কোনো নাম দিয়ে সন্নিবেশিত করতেন, তা হলে বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হত মনে হয়।

তা সত্ত্বেও এ বইয়ের বিষয়গুরুত্ব ও মর্যাদা লেখক যে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন তা স্বীকার করতে হবে। লেখকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিজ্ঞানের দুরূহতায় তা বিশেষ আড়ষ্ট হয় নি বলে তাঁর কৃতিত্ব আরও বেশি। যেটুকু আড়ষ্টতা ও একঘেয়েমি মধ্যে মধ্যে লেখায় প্রকাশ পেয়েছে তা বিজ্ঞানপুস্তকের তালিকাসুলভ পরিচয়-বাহুল্যের জন্য। তথ্য সংগ্রহে ও নির্বাচনে লেখক যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা একবাক্যে প্রশংসনীয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ বই প্রকাশ করে বিদ্যোৎসাহী বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

বিনয় ঘোষ

বাণভট্টের আত্মকথা। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

তু কুনকে ধান। তকসী শিবশঙ্কর পিল্লাই। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, তিন টাকা।

মাটির মানুষ। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, দুই টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

মাটির মূর্তি। রামবৃক্ষ বেণীপুরী। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

নানার হাতি। ভকস মুহম্মদ বশীর। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, দুই টাকা।

বাণভট্টের আত্মকথা অভিনব উপন্যাস। সংস্কৃত সাহিত্যের সুপরিচিত কবি বাণভট্টের কল্পিত জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী প্রসিদ্ধ বই। বাণভট্ট এ দুখানি বইতে যেসব কথা বলেছেন তা থেকে কবিজীবনী জানবার জন্যে পাঠকের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কবি নিজে সে কাজ করেছেন হর্ষচরিতের প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে এবং কাদম্বরীর সূচনাতে। কিন্তু সে যৎসামান্য। হর্ষচরিত এবং কাদম্বরীতে কবিজীবনীর যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতে কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। পাঠকের অগস্ত্যতৃষ্ণা গণ্ডুষে মিটতে চায় না। প্রধানত এই তৃষ্ণা মেটাবার আগ্রহ থেকেই 'বাণভট্টের আত্মকথা'র সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, লেখক হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তথ্যের উপর বেশি জোর দেন নি। সামান্য তথ্যের উপর নির্ভর করে গ্রন্থরচনা করতে হলে লেখকের কল্পনাশক্তির বিস্তৃতি চাই, সতর্কতার প্রয়োজন বেশি, পরিবেশ ফুটিয়ে তোলবার মত দক্ষতাও অর্জন করতে হয়। বাণভট্টের সময়ের চিত্ররূপের বাস্তবতা পরিস্ফুট করবার জন্যে দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছেই। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সঙ্গে যদি সংযমের শাসন থাকে তবেই এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে সেই অপরূপতা আছে। তথ্যস্বল্পতা-বিষয়ে লেখকও সচেতন। সেজন্যে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী এবং বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন লেখক। দ্বিবেদী মহাশয় পাদটীকায় সে-সমস্ত গ্রন্থের এবং গ্রন্থের অংশবিশেষ উল্লেখও করেছেন। এই কারণে 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে ঐতিহাসিক পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ আছে। বর্ণনাতে সংস্কৃত সাহিত্যের মনোহারিত্ব এবং চমৎকারিত্বের স্বাদ পাওয়া যায়।

লেখকের রচনাশৈলী বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুরূপ। কাহিনীর গতিপ্রবাহের দিকে বাণভট্টের মত হজারীপ্রসাদও অবহিত নন। বাণভট্টের মতই দ্বিবেদী মহাশয় রাজপ্রাসাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য পর্যবেক্ষণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, চৈত্য কিংবা মন্দিরের পূত সৌন্দর্য আস্বাদনে আগ্রহশীল, নরনারীর অনুভূতির বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে উৎসাহী। প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় বাণভট্টের মত লেখকও অকৃপণ। সেকালের বৈদিক-অবৈদিক অনুষ্ঠান-উৎসবের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করে হজারীপ্রসাদ পৌরাণিক কালটিকে বাস্তব করে তুলেছেন। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে উপমার পর উপমার মালা গেঁথে যেতে হজারীপ্রসাদের ক্লান্তি দেখা যায় না। লেখক বিস্মৃতযুগে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন। শ্রীহর্ষের সভা প্রত্যক্ষ করেছেন।

নচেৎ এমনভাবে বাণভট্টের যুগটিকে পাঠকের হৃদয়বেদ্য করা সহজ হত না। রাজসভার অনেক রত্নের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনিও এক রত্ন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র আজ অনেক স্পষ্ট। তথাপি ইতিহাস সেকালের সব খুঁটিনাটি বিবরণ উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হয় নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে চেষ্টা করেছিলেন গবেষণায় ও সাহিত্যে। তাঁর উপন্যাসগুলি নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রাচীন কালের একটা মোটামুটি চিত্র প্রকাশ করেছে। হজারীপ্রসাদ প্রাচীন ভারতের সেই বিস্মৃতযুগের ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। বাণভট্ট এমনই একটা সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে-সময়ে কি ধর্মবিশ্বাসে কি রাষ্ট্রনীতিতে কি সমাজব্যবস্থাতে এক বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। বাণভট্ট শ্রীহর্ষের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, রণনীতি লক্ষ্য করেছেন, রাজ্যের বিলাসকলাকুতূহল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। যশোবর্মা, রাজ্যবর্ধন, শ্রীহর্ষের কাহিনী 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে অনেকখানি অংশ জুড়েছে। লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে বাণভট্ট নিপুণিকার সহায়তায় সেই রাজদ্বন্দ্বে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কেমনভাবে বাণভট্ট বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ভট্টিনীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাণভট্টের সেই পরিক্রমার অত্যুজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন দ্বিবেদী মহাশয় কল্পনাবলে। হর্ষচরিতের ঘটনা বর্ণনার সম্মোহনশক্তি এবং কাদম্বরীর শিল্পকুশলতা এই উভয় গুণ 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে দেখা যায়। নিপুণিকা এবং ভট্টিনী, পত্রলেখা এবং মহাশ্বেতার মত পাঠকচিত্তকে চিরকাল আকর্ষণ করবে। দূরত্বের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। দূরত্বের মোহকে দ্বিবেদী মহাশয় সৌন্দর্যের বাতাবরণে স্থাপিত করে অসামান্যতা দিয়েছেন। অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে; আমাদের সে রাজ্যের সঙ্গে লেখক রাখীবন্ধন করিয়ে দিয়েছেন। 'বাণভট্টের আত্মকথা'র এই অত্যাশ্চর্য শক্তি বিস্ময়কর।

বইটির অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়। পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের অধিকারী শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় এই বইটির সার্থক অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে এক অনবদ্য বস্তু উপহার দিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের 'দু কুনকে ধান' কেরলের চাষী-মজুরের কাহিনী। কেরল অঞ্চলে যারা জমিতে ফসল ফলায় তাদের বলা হয় পরয়ন এবং পুলয়ন। পরয়ন এবং পুলয়ন সম্প্রদায় জমির মালিক নয়। পরিশ্রমের বিনিময়ে দু কুনকে ধান তাদের রোজকার বরাদ্দ। এদের বিধাতা তম্পুরাণ সম্প্রদায়। তম্পুরাণার পরয়ন-পুলয়নদের ঋণ দেয়, মাঝে মাঝে চাষীদের বিপদে সাহায্যও করে। ঋণের জালে পরয়ন পুলয়ন তম্পুরাণদের কাছে বাঁধা পড়ে। ফলে 'দাস'দের উপর মালিকদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হয়ে যায়। দীর্ঘকালের এই প্রথাকে মেনে নিয়ে কেরলের জমিব্যবস্থা চললেও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরয়ন-পুলয়নরা আত্মসচেতন হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। শিবশঙ্কর পিল্লাই তাঁর 'দু কুনকে ধান' বইটিতে কোরণ নামে এক চাষীর জীবনালেখ্যর সাহায্যে জমিব্যবস্থার এই ভয়াবহ দিকটি অনাবৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। তম্পুরাণদের নৃশংসতা-বর্বরতাকে লেখক কশাঘাত করেছেন। তিনি পরয়ন-পুলয়নদের মর্মজ্বালা আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কোরণের সংগ্রামকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করে তিনি সংগ্রামের সাফল্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। গ্রন্থে কোরাণের স্ত্রী চিরুতার নারীজীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রীযুক্ত পিল্লাই সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। অত্যাচার, অবিচার সংগ্রাম ইত্যাদির বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে শিবশঙ্কর পিল্লাই মানবমনের চিরন্তন স্নেহ-প্রেম-মমতার

কথাও বিস্মৃত হন নি। এই সকল বর্ণনায় লেখকের শিল্পকুশলতার সঙ্গে আন্তরিকতার অপরূপ যোগাযোগ ঘটাতে ‘দু কুনকে ধান’ সর্বহারার জীবনভাষ্যরূপে পরিণত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর ‘মাটির মানুষ’ উড়িষ্যার মধ্যবিত্ত চাষীজীবনের প্রতিচ্ছবি। একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ বর্তমানকালে দ্রুত অপহৃত হচ্ছে। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের মহিমা আজও আমাদের আকর্ষণ করে। বরজু প্রধান এবং ছকড়ি এই দুই ভাইয়ের সংসারে ভাঙন ধরল। বরজু ভাইকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু ছকড়ি পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। পরিণামে স্নেহের জয় সূচিত হয়েছে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী একজনের সংকীর্ণতা এবং আর একজনের মহত্ত্বকে পাশাপাশি স্থাপন করে একটি উঁচু আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সৌভ্রাত্রের পরম রমণীয়তা বইটির প্রধান আকর্ষণ।

শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ বেণীপুরী এমন কতকগুলি চরিত্র নিয়ে ‘মাটির মূর্তি’ রচনা করেছেন যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতিপরিচয়ের। এই অতিপরিচয়ের জন্যে এদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল সামান্য, এদের জীবনের কোনও মহত্ত্বই আমরা দেখতে পাই না। এমন-কি সাহিত্যে এদের প্রবেশাধিকার আছে কিনা সে বিষয়েও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। সেই কারণে লেখক ‘এই সব মাটির মূর্তি’ সম্বন্ধে কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে ‘এই অসুন্দর মূর্তিগুলোর মধ্যে যে বস্তু আছে তা খুঁজে দেখার কথা আমাদের মনেই হয় না; এ বস্তুটির নাম প্রাণ। শকুন্তলা বশিষ্ঠ শিবাজী এবং নেতাজীর ভক্তবৃন্দদের নিজের গ্রামে বুধিয়া বালগোবিন ভগত বলদেব সিং এবং “দেব”দের চেনবার জানবার অবসর কোথায়?’ শ্রীযুক্ত বেণীপুরীর মানুষের জীবনকে চেনবার জানবার কৌতূহল অসামান্য। এই কৌতূহলের বশে তিনি কয়েকটি গ্রাম্য অখ্যাত অনাদৃত মানুষের জীবনকাহিনী নিয়ে মনুমেণ্ট গড়ে তুলেছেন। বিষয়ের তুচ্ছতা লেখকের সহানুভূতিতে এবং আন্তরিকতায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাহিত্যের ‘সত্যে’র ইঙ্গিতবাহী এই জীবনচরিতগুলি, হিন্দী সাহিত্যে কেন, যে-কোনো সাহিত্যে অমরতার দাবি করতে পারে।

মোট বারোটি চলাফেলা মানুষদের কথাচিত্র নিয়ে ‘মাটির মূর্তি’ রচিত। চরিত্রগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মহৎ বস্তু চোখে পড়বার নয়। কিন্তু সাধারণ জীবনে যে আসাধারণতার প্রকাশ দেখা যায়, শ্রীযুক্ত বেণীপুরী তারই চকিত-চমক ক্ষণগুলিকে তাঁর লেখায় ভাস্বর করে রেখেছেন। লেখকের মমত্ববোধের স্পর্শে এই দ্বাদশ পুত্তলিকা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বেণীপুরী পর্বতশীর্ষের আলোকের কথা বলেন নি, সমতল-ভূমির চিত্র রচনা করেছেন। শিখরদেশের আলোক আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু সে বড় দূরের; সমতলভূমির আলোক আমরা গ্রহণ করি, তার সঙ্গে আমাদের নিত্য চেনা-জানার সম্পর্ক। বুধিয়া রাজিয়া বৈজুমামা সরযুভাই আমাদেরই পরিচিত জগতের। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্যকালের। শ্রীযুক্ত বেণীপুরী এই নিত্যকালের সম্পর্কটিকে পাকা করে দিলেন।

বৈকম মুহম্মদ বশীরের নানার হাতি একটি অভিজাত মালয়লম মুসলমান পরিবারের কাহিনী। সেকালের বিশ্বাস এবং প্রতাপ নিয়ে ভট্টনটীমা একালকে জয় করতে চেয়েছিল। ভট্টনটীমার বংশ প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে দীপ্ত। বংশমহিমার ঐশ্বর্য নিয়ে ভট্টনটীমা একালেও দেশবরেণ্য। তাঁর স্ত্রী বংশগৌরব সম্বন্ধে সচেতন, এ বংশের একটি হাতি ছিল—ভট্টনটীমার কন্যা কুঞ্জুপাতুম্মার নানার হাতি। কাহিনী-অংশে হাতির উপস্থিতি নেই। কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মার স্বপ্ন রচিত হয়েছিল এই হাতিটিকে কেন্দ্র করে, এই হাতিটি

ভট্টনটীমার বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক। তারই স্পর্শ আছে কুঞ্জুপাতুম্মার মুখে ছোট্ট একটি তিলকে আশ্রয় করে। কুঞ্জুপাতুম্মার জীবন কেটেছে পিতামাতার শিক্ষায়। সে শিক্ষায় ছিল আভিজাত্য, চিরাচরিত ধর্মনীতি, এবং সাধারণজীবনের প্রতি উপেক্ষা। কুঞ্জুপাতুম্মা মানুষ হয়েছে এই পরিবারে। প্রথার বন্ধনে, শাস্ত্রীয় অনুশাসনে, অবরোধের অন্তরালে। এই প্রাচীরের মধ্যে তার জগৎ। এমন সময় দেখা দিল বিপর্যয়। ভট্টনটীমা মামলায় হেরে গেল। প্রাচীন ঐতিহ্য ছেড়ে তারা প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে এল। বাঁধল নূতন ঘর। সেখানে প্রকৃতির ছায়ায় কুঞ্জুপাতুম্মা নিজেকে আবিষ্কার করল। সেকালের বিশ্বাসে ঘা লাগল নূতন চেতনার। তার জীবনে এল নিজার আহম্মদ আর সখী লুটাপী। লুটাপী আর নিজার আহম্মদ কুঞ্জুপাতুম্মাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে দিল। বহু তিক্ততার মধ্য দিয়ে কুঞ্জুপাতুম্মা লাভ করল নিজারকে। তার এই ভাগ্যপরিবর্তনে গ্রামবাসীরা ব্যঙ্গ করল। নানার হাতিকে তারা বলতে লাগল কুড়িআনা (ছোট ছোট পোকা)। কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মা এতকাল ছিল অসূর্যম্পশ্যা, এখন সে সোজা হয়ে জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই ব্যঙ্গের উত্তরে সে ঈষৎ হেসে বাস্তবকে বরণ করে নিল প্রসন্নমনে।

মুহম্মদ বশীর সেকাল ও একালের দ্বন্দ্বসংঘাত দেখিয়েছেন কুঞ্জুপাতুম্মাকে কেন্দ্র করে। পরিণামে একালের জয় সূচিত হয়েছে। এই জাতীয় অধিকাংশ রচনায় আজকাল হৃদয়ের উত্তাপ কিঞ্চিৎ কম থাকে। একটা পরিচিত সুলভ সামাজিক সমস্যাকে ছকে ফেলে বর্ণনা করার লোভ লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু মুহম্মদ বশীরের রচনায় হৃদয়ের উত্তাপ আছে। ভট্টনটীমার চরিত্র-অঙ্কনে লেখক ক্ষয়িষ্ণু জীবনের যে প্রতিচ্ছবি দিয়েছেন তা অভিজ্ঞতার দ্বারা পুষ্ট, সমবেদনার দ্বারা অনুরণিত। কুঞ্জুপাতুম্মার মা কুঞ্জুতাচুম্মার সঙ্গে ভট্টনটীমার কলহ প্রাত্যহিকতার একঘেয়ে বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নি। লেখকের রচনায় কুঞ্জুপাতুম্মার চরিত্রটি আশ্চর্য সাফল্য পেয়েছে। কুঞ্জুপাতুম্মার সরল বিশ্বাস, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় আত্মীয়তা, নবজাত প্রেমের আবেগমধুর প্রকাশ মুহম্মদ বশীর দরদ দিয়ে এঁকেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই অনুবাদ-গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। নিলীনা আব্রাহামের অনুবাদকর্ম প্রশংসার্হ।

বিভিন্নভাষী ভারতবাসীর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে সাহিত্য অকাদেমী অনুবাদকার্যে অগ্রসর হয়েছেন। এ প্রচেষ্টার সার্থকতা সকলেই স্বীকার করবেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মানুষকে জানবার পক্ষে সাহিত্য একটা বড় সম্পদ। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থগুলি সাহিত্য অকাদেমীর সেই আন্তরিকতাকে সপ্রমাণ করেছে।

বিজিতকুমার দত্ত

সাহিত্য পত্রিকা ॥ ১৩৬৪, বর্ষা ও শীত সংখ্যা। ১৩৬৫, বর্ষা ও শীত সংখ্যা। ১৩৬৬, বর্ষা ও শীত সংখ্যা। সম্পাদক আবদুল হাই ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ॥

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ॥ প্রথম সংখ্যা পৌষ, ১৩৬৩। দ্বিতীয় সংখ্যা ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪। দ্বিতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৩৬৫ ॥

Indian Literature : Vol I, No I and 2. Vol II, No I and 2. Sahitya Akademi, New Delhi.

বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই মাতৃভাষা। মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করছে আলোচ্য প্রথম পত্রিকা দুখানি। 'সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সব কয়টি প্রবন্ধই গবেষণাধর্মী। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনা, প্রাচীন গীতি ও পদসংকলন প্রকাশ, প্রধানত এই তিনটি প্রসঙ্গ মুখ্য স্থান অধিকার করলেও ঐতিহাসিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবীণ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ্ এবং নবীন অধ্যাপক আবদুল হাই উভয়ে ব্রতী হয়েছেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (শীত সংখ্যা ১৩৬৫) নামের সুবৃহৎ প্রবন্ধে—প্রকৃতপক্ষে একখানি সম্পূর্ণ বই—একটি বিতর্কমূলক প্রস্তাব তুলছেন। তিনি মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার জন্ম 'গৌড়ী প্রাকৃত' ও 'গৌড়ী অপভ্রংশে' নির্দেশ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখানো যায় এবং ভাষাতত্ত্বের ছাত্রেরা অনেকেই তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বীকার করবেন না। তবু নতুন ধরণের চিন্তার দিক দিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অধ্যাপক আবদুল হাই 'বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি' 'বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি' ও 'বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার' 'বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ' এই চারটি প্রবন্ধে বাংলাভাষার ধ্বনিগত রূপ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে প্রয়োগ-সিদ্ধ আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত রীতিতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার জন্য তিনি সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তিনি চলিত বাংলায় ঝরঝরে গদ্যে বাংলা ভাষাতত্ত্বের ধ্বনিগত রূপের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। বক্তব্য কোথাও দুর্বোধ্য বা পরিভাষা-কণ্টকিত হয় নি। প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বাংলা স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিচার করেছেন। ভাষাতত্ত্বের উপর লিখিত এমন মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ রচনা বাংলায় বেশি চোখে পড়ে না। ১৩৬৬ বর্ষা সংখ্যায় হাই সাহেবের 'ধ্বনিগুণ' প্রবন্ধটিতে ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পর চোখে পড়ে পুঁথি-সম্পাদনার সযত্ন ও সতর্ক প্রয়াস। পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ সাহিত্যসেবীরা যে এদিকে ঝুঁকেছেন এ খুব আশার কথা। 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় আহমদ শরীফ, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কাব্য নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে উভয়ের রচনা সম্পূর্ণ মুদ্রিত করেছেন। উভয়ের কাব্য পড়লে দেখা যাবে শ্রীধর যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখেছিলেন সাবিরিদ খান তাকেই অনুকরণ করেছিলেন। সাবিরিদ খানের কাব্যে শ্রীধরের কাব্যের আক্ষরিক মিল দেখা যায়। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খান উভয়ের রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে চট্টগ্রামে, উভয়ের

কাব্যের পত্র-সংখ্যা (যা পুঁথিতে পাওয়া গেছে) প্রায় একই। দ্বিজ শ্রীধর গৌড়ে গিয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নেই। আহমদ শরীফ সাহেব সাবিরিদ খানকে দ্বিজ শ্রীধরের পূর্ববর্তী কবি বলে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে অনুমানের অংশই বেশি। বরং এর তুলনায় 'আলাউল বিরচিত তোহ্‌ফা' সম্পাদনায় তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আলাউলের জীবনেতিহাস ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। বিশেষত 'তোহ্‌ফা' কাব্যখানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেরই ঐ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হবে। এই পর্যায়ে (১৩৬৫ বর্ষা সংখ্যায়) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত 'লালন শাহ ফকীরের গান'গুলি (২৯৭টি) মুদ্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয়। লালন শাহ ফকীরের গান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। লালন শাহের জীবনী ও তাঁর সাধনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকলে ভালো হত। ১৩৬৬র শীত সংখ্যায় আহমদ শরীফ মুহম্মদ খান -বিরচিত 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদে'র একখানি পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে বইখানি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

'সাহিত্য পত্রিকা'র তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিস্মৃতপ্রায় কবিদের কাব্যালোচনা। কাজী দীন মুহম্মদের 'পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল' (বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪), আনিসুজ্জামানের 'সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ্‌' ও 'সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য' (বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৫) প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আনিসুজ্জামান গরীবুল্লাহ্‌ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপিত করেছেন এবং গরীবুল্লাহ্‌র কবিপ্রতিভা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "গরীবুল্লাহ্‌ও আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রী। তিনি প্রায় ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক— কিন্তু সেই কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য তাঁর সাধ্যাতীত ছিল ; রায় গুণাকরের পাশে সায়ের তাই ম্লান। রামপ্রসাদের তিনি সমকালীন— কিন্তু যে আত্মভাবমুখীন গীতি রচনার জন্য কবিরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা, গরীবুল্লাহ্‌র কাব্যে সেই আত্মতন্ময়তার একান্ত অভাব।· ·রোমান্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে তাঁর ইউসুফ-জেলেখা উল্লেখযোগ্য রচনা— এটাই তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।" ১৩৬৬ বর্ষা সংখ্যায় আনিসুজ্জামানের 'শেখ ফজলল করিম' প্রবন্ধটিও তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান। 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত অন্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীঅজিতকুমার গুহের 'রূপ প্রতীকের ধারা', শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি', কাজী আবদুল মান্নানের 'উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম মানস', আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহর 'বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে দৌলত কাজী রচিত 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্য সম্পর্কে গোলকুণ্ডা-বিজাপুর রাষ্ট্রের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে আরাকান রাজসভার যোগ উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর আরেকটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ 'উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য (শীত সংখ্যা ১৩৬৬)।

১৩৬৬ বর্ষা সংখ্যার একটি সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ মনিরুজ্জামানের 'বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'। শীত সংখ্যার তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কাজী আবদুল মান্নানের 'জাতীয় আন্দোলন-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি', মুহম্মদ সিদ্দিক খানের 'বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা' এবং মুনীর চৌধুরীর 'বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন'। এ সংখ্যার আর-একটি সম্পদ মিশরের বিখ্যাত সুফী কবি-সাধক বু'সিরী-র কবিতার নূরুদ্দীন আহম্মদ-কৃত বঙ্গানুবাদ। 'সাহিত্য পত্রিকা' তার উদ্‌যোগের জন্য সর্বজননন্দিত হবে।

"শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি জীবনের সর্বস্তরে দেশের ভাষা দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করুক—ইহাই একাডেমীর একমাত্র প্রার্থনা।" এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে 'বাংলা একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা এবং আলোচ্য পত্রিকা তারই মুখপত্র। এই পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের কয়েকজন মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবদুল কাদিরের 'পদ্মাবতী', আশরাফ সিদ্দিকীর 'মীর মশাররফ হোসেন', গোলাম সাকলায়েনের 'দাদ আলীর কাব্য পরিচয়' প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা চলে। কবিদের পরিচয় দানে ও গ্রন্থপঞ্জীরচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রচনাগুলিতে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানবার সুবিধা হল। এই প্রবন্ধগুলি রচনায় লেখকেরা সমকালীন ইতিহাসকে বিস্মৃত হন নি। কবিদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী রচনায় স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধকচরিতমালা'য় গৃহীত রীতি অনুসৃত হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে এস. এ. হালীমের 'সৈয়দ ও লোদী আমলে উর্দু ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ', মমতাজুর রহমান তরফদারের 'চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা' বিশেষভাবে মূল্যবান। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের অনূদিত ও বিশ্বভারতী অ্যানালস্‌-এ প্রকাশিত চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে শেষোক্ত প্রবন্ধটির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। আর-একটি প্রশংসনীয় কাজ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংগৃহীত 'পাগলা কানাই'য়ের গীতসংকলন। পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক এই সকল উদ্যোগ বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে পরম কাম্য। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাওয়া দরকার এবং উচ্চমানের প্রবন্ধ আরও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাক্ষ্য পত্রিকাগুলির সর্বত্র বিস্তৃত, তবে সেই উৎসাহ কেবলমাত্র মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কেই যেন নিঃশেষে ব্যয়িত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বহুভাষাভিত্তিক ভারত-রাষ্ট্রে ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি ভাষা এখনও পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর পরস্পরের মতামত জ্ঞাপনের একমাত্র বাহন। তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্র রূপে ইংরেজি ভাষাই সর্বাগ্রগণ্য। সেজন্যই ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমির মুখপত্র *Indian Literature* ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যুক্তিপূর্ণ। আলোচ্য চারটি সংখ্যায় শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হয়নি, জাপানী যুগোশ্লোভ আমেরিকান ফরাসী ইংরেজি বুলগারিয়ান রুশীয় প্রভৃতি বহু বিদেশী সাহিত্যিকের রচনাও মুদ্রিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল এক ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে প্রদেশভেদে ও অঞ্চলভেদে ভাষাভেদ হেতু প্রতিবেশীর সাহিত্যসৃষ্টিকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত সুযোগ হয় নি। তার ফলে ক্ষতি হয়েছে আমাদেরই। সাহিত্য অকাদেমি আমাদের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক দানপ্রতিদানের অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার। শ্রীসোমনাথ মৈত্রের 'Short Stories of Tagore', শ্রী এম. ইউ. মালকানির 'Tagore the Playwright', শ্রীহুমায়ুন কবীরের 'Tagore's Poetry' এবং ভিক্টোরিয়া

ও'কাম্পোর 'West meets East—Tagore on the banks of the river Plate'—সব কয়টি প্রবন্ধই সুলিখিত। তবে শ্রী মালকানির রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা সম্পর্কিত প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ ও অসমৃদ্ধ।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে শ্রী ভি. রাঘবনের 'The Aesthetics of Ancient Indian Drama' প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পার্থক্যটি সুচারুরূপে আলোচিত হয়েছে। আশা করা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আরও আলোচনা পরে বার হবে। ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের আলোচনা পর্যায়ে তামিল সাহিত্যের বিখ্যাত কবি 'ভারতী', মালয়ালাম সাহিত্যের ভল্লাথল, কানাড়ীর ত্যাগরাজকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন জনাব এ. এ. এ. ফৈজী এবং র‍্যাল্‌ফ রাসেল। ফৈজী সাহেব লিখছেন উর্দু সাহিত্যের অমর শিল্পী গালিব সম্পর্কে, আর শ্রীরাসেল লিখেছেন আঠারোর শতকের একজন ব্যঙ্গরসিক কবি সউদার বিষয়ে। এই পর্যায়ে খাজা আহ্‌মদ ফারুকীর মওলানা আজাদ সম্পর্কিত রচনাটি সুপাঠ্য।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার সম্পর্কে শ্রীউমাশঙ্কর যোশীর 'Modernism and Indian Literature' এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'The meeting of East and West' প্রবন্ধটি প্রগতিশীল দৃষ্টির সাক্ষ্যবহ। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিভূতিভূষণের আরণ্যক' এবং শ্রীসরোজ আচার্যের 'রাজশেখর বসুর আনন্দী বাঈ ও অন্যান্য গল্প' সম্পর্কে তিনটি লেখা বার হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনায় পত্রিকাখানির বিভিন্ন সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে। জাপান থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকার দানে তার ডালা ভরে উঠেছে। জাপানী লেখক Seijiro Yoshizamaর Tales of Genji, Ivo Andricএর Cedomir Minderovic (The Chronicler of Bosnia), Philip Youngএর 'American poetry in the 20th Century', Stanislas Ostrorogএর Moliere's plays, H. D. F. Kittoর Greek drama, Panteley Zarev-এর Lyndmil Stoyanov এবং M. C. Bradbrookএর Ibsen প্রভৃতি রচনাগুলি সর্বজনবোধ্য করে রচিত, অথচ উচ্চমানের।

পত্রিকাখানির আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রতি সংখ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলির তালিকা। এই গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রিত হওয়ায় দেশে ও বিদেশে পাঠকগোষ্ঠীর উপকার হবে। আলোচ্য চারটি সংখ্যায় যথাক্রমে অসমীয়া বাংলা গুজরাটী ও হিন্দী পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তবে বিস্ময়ের বিষয় বাংলা সাহিত্যের তালিকায় দেখা গেল দীনবন্ধু মিত্রের 'আমার জীবন' স্থান পেয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র এ-নামের কোনো বই লেখেননি। রামরাম বসুর লেখা 'লিপিমালা' আর যাই হোক 'Fiction' পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নয়। এ রকম ভুল তালিকাটিতে আছে। ঐ তালিকা আরও মনোযোগের সঙ্গে রচিত হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

গ্রন্থবার্তা। শীলভদ্র। প্রথম খণ্ড, শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। মূল্য চার টাকা।
গ্রন্থবার্তা। শীলভদ্র। দ্বিতীয় খণ্ড, এভারেস্ট বুক হাউস, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।
সোনার আলপনা। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এভারেস্ট বুক হাউস, কলিকাতা ১২। মূল্য আট টাকা।

প্রতিদিন বইয়ের দোকানে শো-কেসে পুরোনো বইয়ের পাশে নতুন-নতুন বইয়ের ভিড়। উদাসীন পথিক থমকে দাঁড়ান, এবং কিছুক্ষণ যে চোখ বুলিয়েও নেন তার কারণ শুধু মোহন মলাটের আকর্ষণই নয়। লেখক প্রকাশক প্রচ্ছদশিল্পী আর মুদ্রকের সমবেত সহযোগিতায় যে-একটি বিচিত্র নাটক ঐ শো-কেসের মধ্যে অভিনীত হয়ে চলেছে, তার দর্শক হওয়ার রোমাঞ্চ এর ভিতরে নিহিত। আর, যাঁরা শুধু নিঃস্পৃহ অথচ কৌতূহলী দর্শক নন? যাঁরা পাঠক? এঁরা শুধু দৃষ্টির রস পাবার জন্য নয়, অন্তর্দৃষ্টির রসতৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ঐ কাচঘরের বাইরে দাঁড়ান, তারপর বই কেনবার জন্য উৎসুক হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

বস্তুত, আজকের পাঠকের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা নির্বাচনের সমস্যা। যেসব 'গ্রন্থ সমালোচকের সৌজন্যে 'ক্লাসিক্স' নামাঙ্কে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে নাহয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু যেসব বই একেবারে নতুন? যে-বইয়ের লেখকের নাম কখনো শুনি নি? অনতি-'স্নব' পাঠকের পক্ষে এইসব বইয়ের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী হওয়া সম্ভব নয়। এই সময়ে প্রয়োজন একজন প্রদর্শকের, যিনি প্রাচীন শোণিতে মানুষ অথচ যোগ্য নতুনকেও সমাদর করতে পারেন। আলোচ্য তিনটি গ্রন্থের লেখক সেই রকম একজন প্রদর্শক, যিনি অনিঃশেষ গ্রন্থতীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলিতে আমাদের নিয়ে যেতে সক্ষম। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতই শীলভদ্র, সুরুচিশীলিত যাঁর বোধ এবং বন্ধুজনোচিত যাঁর সাহায্য করবার প্রবণতা।

বিখ্যাত ও হঠাৎ-প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত ও অপরিচিত— বিভিন্ন রচয়িতার প্রতিই গ্রন্থকার তাঁর প্রসন্ন অথচ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখ্য প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর মন জাগর, উৎসুক। তাঁর আনন্দ আত্মতৃপ্তির ইন্ধনে নয়, সমস্ত পাঠকের সঙ্গে মিলিত রসাস্বাদনে। লেখক এবং পাঠকের মাঝখানে তিনি উভয়ত আতিথেয় সেতুর মতই দাঁড়িয়ে আছেন। পাঠক এবং লেখক— উভয় শিবিরের দাবি-দাওয়া বা চাহিদা-সরবরাহের সমস্যাগুলি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত জাগরূক।

এই ধরণের পরিচিতিমূলক রচনায় একটা আশঙ্কা থেকে যায়। গ্রন্থের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, শুধু কথঞ্চিৎ রম্য ঔৎসুক্য পাঠকচিত্তে উদ্রেক ক'রেই এ ধরণের রচনার লেখক মনে করেন, দায়িত্ব শেষ হল। কিন্তু আলোচ্য লেখক কথাবস্তু এবং বিন্যাসবিধি দুয়েরই দিকে মনোযোগী। অনুবাদ-সাহিত্যের আপেক্ষিক সুবিধা ও সীমা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সচেতন। সাধারণত, লেখকদের জীবনের আলোয় তাঁদের রচনার নন্দনতত্ত্ব ও প্রকৃতি তিনি নির্ধারণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কীট্সের আলোচনায় প্রচলিত একটি রীতি অনুযায়ী, জীবন-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উপর জোর দিতে গিয়ে কীট্সের রচনার আন্তর গরিমা তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে ব'লে অদীক্ষিত পাঠকের মনে কীট্সের জন্য যতটা অনুকম্পা জাগবে সে-অনুপাতে হয়তো কবি কীট্সের পরিচয় জানবার জন্য আগ্রহ জেগে উঠবে না। বহির্জীবনের সর্ববিধ উত্তেজনা ও সংক্ষোভের অন্তরালে যে কবি-পুরুষ সমাহিত ও সক্রিয়, তার খবর এখানে আশা করছিলাম। অবশ্য, এ রকম দু-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বাদ দিলে অধিকাংশ রচয়িতাসূত্রেই আলোচ্য লেখকের শিল্প-বিবেক গূঢ়তলচারী এবং সংবেদনশীল।

'গ্রন্থবার্তা'র দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি *Writers at Work* নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে লেখকদের নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার প্রস্তুতির স্তরটি তুলে ধরবার যে-আয়োজন আছে, এ-তিনখানি বই পড়েও অনুরূপ আস্বাদ পেলাম। শেষ পর্যন্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকদেরই পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং লেখকদের রচনা-রহস্য পাঠকদের কাছে গোচর করার ব্রত নিয়েছেন। এই ব্রতে যে-বৈচিত্র্য ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রয়েছে, তার জন্য তিনি পাঠকমাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করবেন। সেই পাঠকদের তালিকায় অন্তর্গত হতে পেরে গৌরব অনুভব করছি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পুঁথি পরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। মূল্য পনেরো টাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি। সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাংলা পুথির পরিচায়িকা। সম্পাদক আহমদ শরীফ, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য কুড়ি টাকা।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য যেরূপ প্রসিদ্ধি ও গৌরব লাভ করিয়াছে পুরাতন হস্তলিখিত পুথির মূল্য কম না হইলেও ইহার আলোচনা তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে বলা যায় না। লিপিতত্ত্ব মুদ্রাতত্ত্বের মত পুথিতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে পরিগণিত হয় নাই। তাই পুথির আলোচনায় তেমন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ এই পুথির মধ্যে দেশের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমূল্য নিদর্শন সমূহ বিধৃত হইয়া আছে। পুথির সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত দেশের সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া অসম্ভব।

সত্য বটে, পুথিসংগ্রহ ও পুথির বিবরণ সংকলনের কাজ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু পুথি সংগৃহীত হইয়া নানা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত হইয়াছে। অনেক পুথির বিবরণ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক পুথি অবলম্বনে অপরিচিতপূর্ব অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, কার্য সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর হইতেছে না। পুথি আলোচনার দুইটি প্রধান ক্ষেত্র: প্রথম, পুথি হইতে গ্রন্থের উদ্ধার ও প্রকাশ; দ্বিতীয়, পুথির পরিচয় ও বিবরণ সংকলন। দুই ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট আদর্শ বর্তমান আছে—কিন্তু সাধারণতঃ সে আদর্শ অনুসারে কাজ হয় না। অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে অবলম্বিত পুথিগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা না করিয়া এখান ওখান হইতে কিছু কিছু পাঠান্তর পাদটীকায় সন্নিবেশিত করিলেই কার্য সুসম্পন্ন হইল মনে করা হয়। কোন্ পুথি হইতে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইল অনেকে তাহা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, পাঠান্তরের গুণাগুণ বিচার ও প্রকৃত পাঠ নিরূপণের চেষ্টা ত দূরের কথা। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার গ্রন্থের পুথিগুলি প্রায়শঃ লিপিকর-প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং জনপ্রিয় গ্রন্থের পুথিসমূহের পরস্পরের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিল বেশি। সুতরাং গ্রন্থের সুষ্ঠু সংস্করণ সম্পাদন অতীব দুরূহ। ফলে সন্তোষজনক সংস্করণ বিরল। পুথির বিবরণ সংকলনের কার্যেও আশানুরূপ আগ্রহ ও পরিশ্রমের পরিচয় অল্পক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। দুই-চারিখানি ছাড়া

বিবরণ-গ্রন্থগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। বস্তুতঃ বিবরণগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যহীন—যেন এক ছাঁচে প্রস্তুত। যে কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ বিবরণ সংকলন করিতে পারেন— ইহার জন্য কোন বিশেষ গুণের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে থাকে পুথির বাহ্যিক পরিচয় (উপকরণ, পত্রসংখ্যা, পত্রের মাপ, প্রতি পত্রে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে অক্ষরসংখ্যা প্রভৃতি)। অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে পুথির আরম্ভ মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে পুথির বিষয়বস্তু বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা হয় না। একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুথি হইতে একই ভাবে আরম্ভ ও শেষের অংশ উদ্ধৃত হইলে বিবরণ-গ্রন্থের আকার স্ফীত হইতে পারে কিন্তু পাঠকের তেমন কোনও উপকার হয় না। তবে এইসকল বিবরণ-গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করেন তেমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়ায় ইহাদের দোষগুণ লইয়া সাধারণতঃ কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না। ইহাদের ত্রুটিগুলি গা-সহা হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা প্রণয়নে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীরাও পুথির বিবরণ সম্পর্কে উৎসাহযুক্ত মনে হয় না। সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। সংস্কৃত আরবী ফারসী ও পালি পুথির বিবরণ সরকার-নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সংকলন ও প্রকাশের ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করিতেছেন। সরকারী নিয়মে পুথির বিবরণকে অযথা স্ফীত করিবার সুযোগ থাকিবে না। পুথি সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য স্বতন্ত্র স্তম্ভে সন্নিবেশিত হইবে। কোন পুথি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা মন্তব্যের ঘরে উল্লিখিত হইবে— পরিশিষ্টে দরকারমত পুথির অংশ উদ্ধৃত হইবে এবং ভূমিকায় পুথিগুলির মূল্যবিচার ও আনুষঙ্গিক আলোচনা থাকিবে। ইতিপূর্বেও এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু বিবরণ সংকলিত হইয়াছে— মামুলি ধরণের বিবরণের মধ্যেও কেহ কেহ বিবৃত পুথিসম্পর্কে নানা তথ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে পুথির বিবরণের দোষগুলির মত গুণগুলিও পণ্ডিতসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ফলে এই ব্যাপারে কোন সুপরিকল্পিত পদ্ধতি এখনও গড়িয়া ওঠে নাই।

এইরূপ বিশৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল তাঁহার 'পুঁথিপরিচয়ে' একটি কথঞ্চিৎ নবীন পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি তালিকাভুক্ত সমস্ত পুথির বিবরণ না দিয়া নির্বাচিত কতকগুলি পুথির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন এবং ভূমিকায় পুথিগুলির নানা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার বিবরণেও পুথি হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে— অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুথির সম্পূর্ণ অংশই উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে পুথির বর্ণনীয় বিষয়ের পূর্ণ পরিচয় বা বর্ণনীয় পুথি নির্বাচনের হেতু স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয় নাই। পদমেরু নামক বৃহৎ পদসংগ্রহগ্রন্থের পুথিতে এবং বহু বিচ্ছিন্ন পত্রে প্রাপ্ত পদের যে সূচী এই বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পদাবলী লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের যথেষ্ট কাজে লাগিবে। কোনও বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা যাঁহারা করিতে চান পুথির বিবরণ এইরূপ ভাবে তাঁহাদের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিতে পারিলেই বিবরণ সংকলন সার্থক হয়। পুথির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করাই বিবরণ-সংকলয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আদর্শ বিবরণ প্রস্তুত করিতে হইলে পুথি পড়িয়া তাহার বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে হইবে— অন্য পুথির, বিশেষ করিয়া মুদ্রিত বিবরণ বা সংস্করণের সহিত আলোচ্য পুথির মিল-অমিল দেখাইয়া দিতে হইবে। পুথির বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা জানিতে পারিলেই গবেষক ঠিক করিতে পারেন ইহা তাঁহার কাজে লাগিবে কি লাগিবে না। অন্যথা কোন গ্রন্থের সমস্ত পুথি আলোচনা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

পুথির বিবরণ যিনি সংকলন করিবেন তাঁহাকে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ পুথির চর্চাতেই একদল পণ্ডিতকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে— অবসরমত এ কাজ করিলে চলিবে না। বিভিন্ন সংগ্রহে অজস্র পুথি রহিয়াছে যাহাদের কোনও বিবরণ এখন পর্যন্ত সংকলিত হয় নাই— যাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এমন পুথির সংখ্যা কম নহে যেগুলির যথোচিত অনুশীলন হয় নাই। ভবিষ্যতে কোনও পণ্ডিত দরকারমত এগুলির আলোচনা করিবেন এই আশায় এগুলিকে অনালোচিত বা অর্ধালোচিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে কালের কঠোর বিধানে ইহারা আংশিকভাবেও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, যথাসম্ভব সত্বর পুথিগুলি পর্যালোচনার সুব্যবস্থা হইলে দেশের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ উপকরণ উদ্‌ঘাটিত হইবে। যে বিষয়ের পুথি কেবল সেই বিষয়ের তথ্যই যে পুথির মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে উহার মধ্য হইতে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় আবিষ্কৃত হইতে পারে। গ্রন্থের মূল্য যাহাই হউক-না কেন এই সমস্ত তথ্যের মূল্য অবিসংবাদিত। দুই-একটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থের পুথিতে গ্রন্থকার গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উপসংহারে পৃষ্ঠপোষকের ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণশ্লোকগুলি একত্র করিয়া পৃষ্ঠপোষক রাজার সুন্দর বংশপ্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকের নিকট এই প্রশস্তির মূল্য আছে। আবার বিভিন্ন গ্রন্থের পুথির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার ও তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করাও সম্ভবপর হইয়াছে। পুথির উপকরণ, লিপি, লিপিকর, লিপিকাল, লেখনশৈলী, পুথির মালিক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পুথির আলোচনা হইতে পাওয়া যাইতে পারে দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক্ হইতে তাহাদেরও মূল্য কম নহে। আলোচ্য বিবরণ-গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে এইরূপ অনেক তথ্য ছড়ান রহিয়াছে। সম্পাদকগণ সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই। আমি এখানে এইরূপ কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান দিতেছি।

তালপাতায় লেখা বাংলা ভাষার পুথি বিরল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় এরূপ কোন পুথি চোখে পড়ে নাই। এসিয়াটিক সোসাইটিতে কালিকামঙ্গল ও ভক্তিপ্রদীপ নামে দুইখানি গ্রন্থের দুইখানি তালপাতার লিখিত পুথি আছে। চণ্ডীমঙ্গলের একখানি তালপাতার পুথির উল্লেখ পুঁথিপরিচয়ে (পৃ ৯২) পাওয়া যায়। বাংলা পুথিতে নকলের তারিখ হিসাবে অনেকগুলি অব্দের উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষ বিবরণ জানা না গেলেও এগুলি একত্র সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন আছে। পুঁথিপরিচয়ে উল্লিখিত অব্দের মধ্যে অম্‌লি (পৃ ২৬৫, ২৮৭, ৩৩৪) ও এইতি সন (পৃ ১৫৪) স্বল্প-পরিচিত। বিলায়তি বা আম্‌লি সনের প্রচলন উড়িষ্যায় আছে। দুইখানি পুথির শেষে দুইটি কৌতুককর নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বিরাট্ পর্বের একখানি পুথির লেখক পুথিখানিকে গোপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] কবিচন্দ্র-রচিত শিবরামের যুদ্ধের পুথিতে অনুরূপ নির্দেশ দেখা যায়—

'এই পুস্তক যিনি ছাপা করিবে তাহাকে ইষ্টদেবের দিব্য'—পুঁথিপরিচয়, পৃ ৩৬২।

---

১ কিন্তু কেহ গোপনিয় না করেন। তথাহি শাস্ত্রবাক্য।

লিখিতং বহুযত্নেন যদ্ গোপয়তি পুস্তকম্।
মাতা তস্য ভবেদ্ গর্ধী পিতা তস্য [চ] শূকরঃ॥—পুঁথিপরিচয়, পৃ ২৮৯

এইরূপ নিষেধ অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পুথির শেষে লিপিকরেরা নিজেদের ত্রুটি স্বীকার, পুথি-চুরি নিষেধ প্রভৃতি বিষয়ে যেসমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সংস্কৃতের অনুবাদ (পুঁথিপরিচয়, পৃ ২৯, ২৫৬) বা সংস্কৃত উক্তির অনুরূপ (পুঁথিপরিচয়, পৃ ৩২৯)। নূতন কথাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় (পুঁথিপরিচয়, পৃ ২৬২, ২৭৬, ২৮৫)। বিকৃত সংস্কৃতে লেখা একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—

হস্তী বিচলিতপাদানাং জিহ্বা বিচলিত পণ্ডিত (পৃ ২৬২, ২৮৫)
হস্তী টলতি পাদেন জিহ্বা টলতি পণ্ডিত (পৃ ২৭৬)[১]

কোন কোন পুথিতে পুথির মূল্য সম্বন্ধে কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। ১২৪৪ সালে নকল করা ৪২ পত্রের একখানি দণ্ডীপর্বের পুথির দক্ষিণা আট আনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ ১২৭)। পুথির মালিকদের মধ্যে উড়িষ্যার খুরদার গৌরহরি দত্তের নাম করা যাইতে পারে। তিনি ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের পুথির নকল করাইয়াছিলেন। দত্তমহাশয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয় (পৃঃ ১০৩, ২৭২, ২৮৭-২৮৮, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪, ৩৩১)। পুথি নকল করিবার সময় লিপিকরেরা সমসাময়িক নানা ব্যাপারের কথা পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। একখানি পুথিতে কাশী, নদীয়া ও উড়িষ্যার পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বশতঃ দুই দিনে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ ২৮৭):

'এই সম্বৎসরে দো আশ্বিনি হৈবাতে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব কাশী ও নদিয়ার পণ্ডিতদের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সকলে কার্তিক মাসে পূজা করিলেন। উড়িষ্যাদেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজির শ্রীমন্দিরে শ্রীবিমলা ঠাকুরানের পূজা দো আশ্বিনির বিধান না মানিয়া পূর্বানুসারে আশ্বিন মাসে ১৬ দিন পূজা করিয়া দশেরা করিলেন।'

আবদুল করিম সাহেবের পুথির বিবরণে এ জাতীয় যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে।—

ইহাতে বর্ণিত পুথিগুলির ভাষা বাংলা হইলেও অক্ষর অনেক স্থলে আরবী (পৃ ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ২৪৪, ৩১৫, ৪৩৬, ৫৩৮, ৫৬৭, ৫৮০)। পুথিগুলির রচয়িতা ও মালিক মুসলমান—বিষয়বস্তুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি। তবে ইহাদের লিপিকরের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়। দজ্জালনামার লিপিকর রামচন্দ্র গুহদাস (পৃ ২৩৩)। পেশাদার লিপিকর বলিয়া উল্লিখিত কালিদাস নন্দীও একাধিক পুথির নকল করিয়াছিলেন (পৃ ৭৭, ৭৮, ২২৪, ৩৮০, ৪২১, ৫৩৬)। হিন্দুসাহিত্যিকগণ যেমন সম্পন্ন মুসলমানদের নিকট হইতে সাহিত্যরচনায় প্রেরণা লাভ করিতেন, মুসলমান সাহিত্যিকগণও সেইরূপ হিন্দু জমিদারদের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিতেন। এই বিবরণ-গ্রন্থে বর্ণিত দুইখানি পুথিতে (পৃ ৯৮,১৭০) তাহার প্রমাণ আছে। মোহাম্মদ নওয়াজিম খান বালীগ্রামের জমিদার বংশের আদিপুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে গুলে বকাওলি গ্রন্থ রচনা করেন। জমিদার ব্রাহিরাম চৌধুরীর আদেশে মোহাম্মদ লাকি কর্তৃক তুতিনামা রচিত হয়। প্রধানতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত এই পুথিগুলিতে মঘী সন ও ত্রিপুরাব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। হিজরা, বঙ্গাব্দ ও শকাব্দেরও কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

করিম সাহেব সংকলিত বিবরণ-গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার বিষয়বস্তু। মধ্যযুগের বাংলা মুসলিম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে এই বিবরণে বর্ণিত পুথিগুলি বিশেষ মূল্যবান্। বাংলার, বিশেষ করিয়া

---

১ এরূপ কোন কথা সংস্কৃত পুথিতে চোখে পড়ে নাই।

বাংলার মুসলমান সমাজের, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার পক্ষে এই জাতীয় পুথির অনুশীলন অপরিহার্য। পুথিচর্চার দিক হইতেও ইহাদের নানা বৈচিত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। বাংলা পুথির অনুশীলনে করিম সাহেবের কৃত কার্য সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত দুইখণ্ড বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রাচীনতম বিবরণ-গ্রন্থ। পরলোকগত প্রাচীন সাহিত্যরসিকের জীবনব্যাপী সাধনার ফলস্বরূপ এই মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও পুথি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকার পাকিস্তান এসিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থের এক ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধিৎসু অবাঙালি পাঠকের নিকটও ইহাকে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থখানির দুই-একটি ত্রুটির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুথিগুলি অবলম্বনে বাংলার মুসলিম সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভূমিকায় সংযোজিত হইলে এবং পুথিগুলি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত না হইয়া বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত হইলে আলোচনার অনেক সুবিধা হইত।

বাংলা পুথিচর্চার ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানির বৈশিষ্ট্য ও মূল্য যথেষ্ট। বাংলা পুথির দুইটি বিশিষ্ট সংগ্রহের আংশিক পরিচয় ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের পুথির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান্ সংগ্রহ দুইটির পরিচয় নানা ভাবে পণ্ডিতমহলে প্রচারিত হইয়াছে— ইহাদের কিছু কিছু বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ছোটখাট অন্যান্য যে সমস্ত সংগ্রহ পশ্চিম-বাংলা ও পূর্ব-পাকিস্তানের নানা প্রান্তে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের ঘরে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে উপযুক্ত অর্থ ও কর্মীর অভাবে তাহাদের সংরক্ষণ ও বিবরণসংকলনের সুব্যবস্থা না হওয়ায় অমূল্য তথ্যের আধার অনেক পুথি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভারত সরকার সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পুথির বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন— বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথিগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট রক্ষিত প্রাদেশিক ভাষার পুথিগুলির একটা ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সরকারের অবশ্যকর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে হয়। প্রাদেশিক পুরাতত্ত্ব পর্যালোচনার সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে— প্রাচীন দলিলপত্র অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পুথিসম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। পুথিপত্র কোথায় কিভাবে রক্ষিত আছে তাহার বিবরণ-সংকলন এবং পুথিগুলির আলোচনার সুবিধার জন্য যথাসম্ভব তাহাদের একত্র সংগ্রহ করা প্রথম কর্তব্য। যে পুথিগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে— সংগৃহীত পুথিগুলির যথোচিত আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শতাধিক বৎসর পূর্বে সমগ্র দেশে মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথির অনুসন্ধানে এইরূপে কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। আজ সেই কার্যের হিসাবনিকাশ করা এবং অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্ত করার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার পুথিগুলির কথাও মনে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ জলবায়ুর অমোঘ প্রভাবে ও উপযুক্ত যত্নের অভাবে দ্রুত ক্ষয়োন্মুখ পুথিগুলি সম্পর্কে অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে দেশের এই অমূল্য সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমাদের গুরু দায়িত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

জাপানের চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত   ১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সমর, আমার চিঠিপত্র পথের মধ্যে আট্‌কা পড়ে বলে এবার লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এণ্ড্রুজের হাতে এইগুলি দিচ্চি, আশা করি অক্ষতভাবে পাবে। জাপানটা ভাল করেই দেখেচি। তার কারণ এরা আমাকে এদের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়েচে। হঠাৎ বাইরের লোকের এতটা সুবিধে ঘটে না। এদের অনেক ভাল জিনিস দেখেচি। সব চেয়ে এদের সত্য এবং দেশব্যাপী হচ্চে এদের আর্ট। সে আর্ট একটা দিকে চূড়ান্ত সীমায় গেছে কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে এদের আর্টের একটা অভাব আছে, এরা মানব-হৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করেনি— এরা প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়োন্ত করেচে। তোমাদের আর্টের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের একটা আকূতি প্রকাশ পায় সেইজন্যে তাকে লাইনের স্পষ্টতার চেয়ে রঙের আভাসের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে হয়েছে। আমি ভেবে দেখেচি এইটেই ভারতবর্ষের দিক। ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালবাসে— জাপানের আর্টে কালা-গোরার মিলনই প্রধান— এদের কাপড়ে চোপড়েও তাই। ভারতবর্ষের আর্ট যদি পুরো জোরে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এগোতে পারে তাহলে গভীরতায় এবং ভাবব্যঞ্জনায় তার কাছে কেউ লাগ্‌বে না। কিন্তু দরকার হচ্ছে ওর মধ্যে জীবনের জোর পৌঁছনো— যাতে ও খুব ফলাও হয়ে উঠতে পারে। এখন যেন কতকটা কেয়ারি করা ছোট ছোট ফুলগাছের বাগানের মত ওর চেহারা— বনস্পতির অরণ্য চাই যেখানে ক্ষণে ক্ষণে ঝড়ের রুদ্রবীণা বাজে। আমার বোধহয় আয়তন নিতান্ত ছোটো করলে ভাবের পরিমাণও ছোট হয়ে আসে। যাই হোক্‌ জাপানী আর্টের যতই বাহাদুরি থাক্‌ ওর পূর্ণতার সীমায় এসে ও পৌঁচেছে। কিন্তু আমাদের আর্টিষ্টের তুলির সামনে অসীম ক্ষেত্র দেখতে পাচ্চি। সরস্বতী চীন জাপানের কাছে উদ্যানের দরজা খুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তাঁর অন্তঃপুরের দরজা খুলচে— এখানে রসের ভোজ। কিন্তু আমাদের এই রংমহালের কারখানা জাপানীরা একেবারে বুঝতেই পারে না— অথচ আমরা ওদের শিল্পকলার ভিতরকার মাহাত্ম্য বেশ বুঝতে পারি। এর থেকে মনে হচ্চে জাপানী চিত্রকলার অতিপরিণতিই ওর পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেচে— এখন ও আর চলবে না, পথের পাশে বসে পুনরাবৃত্তি করবে কিম্বা বিলিতি ছবির নকল করতে লাগবে।

এখানকার একজন চিত্রকর নভেম্বর মাসে তোমাদের ওখানে যাবে তাকে দিয়ে তোমাদের ছেলেদের পাকা হাতে তুলির টান টান্‌তে অভ্যাস করিয়ো।— তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

রবিকাকা

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত   ২

ওঁ

সুর,

প্রশান্ত সাগরের পূর্ব্ব ঘাট থেকে পশ্চিমঘাটে পাড়ি দিতে চল্লুম। এণ্ড্রুজ ফিরচে তার কাছে সব খবর পাবি। বক্তৃতার আয়োজন একরকম শেষ করেচি। আমেরিকার জন্যে চারটে বক্তৃতা লিখেচি— রথীর

কাছে তার কপি পাঠালুম। এইগুলোর একটা না একটা সহরে সহরে বারবার আউড়ে যেতে হবে। The Nation বলে যেটা লিখেচি সেইটেই সব চেয়ে বেশিবার বল্‌ব— তা ছাড়া নাটক এবং গল্পর reading দিতে পারব। আর্থিক হিসেবে মন্দ হবে না কিন্তু কেবল অর্থ নয়, অনর্থের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। আমি থাকৃতে থাকৃতে তোরা যদি কেউ জাপানে আস্‌তে পারতিস তাহলে অনেক জিনিস দেখ্‌তে পেতিস। সেদিন ওকাকুরার বাড়িতে গিয়েছিলুম, সে জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ওকাকুরাকে তার দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারেনি। সেটাতে এদের অগভীরতা প্রকাশ পায়। কেননা অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে দেখলুম ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখতে পাইনি। বুদ্ধির দিকে এরা খুবই কাঁচা, এদের হাতের মধ্যেই সমস্ত মগজ। এদের হাত এবং আঙুল দেখতে ভারি চমৎকার। এখান থেকে যদি গুটিকতক জাপানী দাসী নিয়ে যেতে পারতুম তা হলে দেখ্‌তে পেতিস এরা কাজ কিরকম সুন্দর করে করতে পারে এবং এরা কিরকম আশ্চর্য্য সেবা করতে জানে।— জীবনস্মৃতির তর্জ্জমা ত প্রায় শেষ হয়ে এল। আমেরিকার ম্যাকমিলানরা এটা ছাপাতে প্রস্তুত আছে। এটা হয়ে গেলে আস্‌চে বছরের মডার্ণ রিভিয়ুর জন্যে "ঘরে বাইরে"টা যদি তর্জ্জমা করিস তাহলে মন্দ হয় না। কেননা ওটা সমস্ত ভারতবর্ষের জন্যে লেখা। আমেরিকায় লেকচারের কাজে অন্তত আমার প্রায় ছ মাস কাটবে। য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রত্যেক বড় সহরেই আমাকে ঘুরতে হবে। এই উপলক্ষ্যে তোরা কেউ যদি আস্‌তে পারতিস তাহলে বেশ হত। কিন্তু তোরা ত সকলেই কাজে লেগে গেচিস্‌। রথীর কাজ কিরকম জম্‌চে কে জানে। যাই হোক পিয়ার্সনকে সঙ্গী পেয়ে আমার খুব সুবিধে হয়েচে— সকল রকমে আমার যত্ন ও সেবা করতে ও কিছুমাত্র ত্রুটি করে না।

তোদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ১১ ভাদ্র ১৩২৩

রবিকাকা

১৯১৬ সালে জাপান-ভ্রমণকালে লিখিত পত্র। মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথ
জাপান নারী-মহাবিদ্যালয়ে। ২৯ অগস্ট ১৯১৬

'সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য'

সম্মুখে উপবিষ্ট ॥ দক্ষিণ হইতে : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
দণ্ডায়মান ॥ দক্ষিণ হইতে : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১২ সালে বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে গৃহীত ফটোগ্রাফ । শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ১

৪৬, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
২০শে ভাদ্র ১৩১৯

পূজ্যবরেষু—

চারু ও মণিলালের চিঠিতে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। আনন্দে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি; কিন্তু চিঠি লিখি নাই। কারণ, বিলাতের অতিব্যস্ত জীবনের মধ্যে, correspondenceএর বোঝা বাড়াইয়া, আপনাকে আর অধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই।

আজ আমার নূতন প্রকাশিত "কুহু ও কেকা" এবং "জন্মদুঃখী" পাঠাইলাম, এবং সেই ছুতায় আপনাকে চিঠি লিখিয়া ধন্য হইলাম।

বাংলার কবির বিলাতে সংবর্দ্ধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু উহা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহাতে তৃপ্তি হয় নাই। সে যাহা হোক্, কবির দিগ্বিজয় জগতের ইতিহাসে, বোধ হয়, একেবারে নূতন জিনিস। কিন্তু প্রতিভার এই প্রাপ্য পূজায় বিস্মিত হইবার বড় বেশী কিছু নাই। আমি জানিতাম, যে, আপনার কবিতার অমৃত আস্বাদ যে পাইবে, সেই আপনার বিশ্বজনীনতায় অপূর্ব্ব সুরে মুগ্ধ হইবে। তা' সে ইংলণ্ডের লোকই হোক আর ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডেরই হোক্।

"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব;
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী! তব প্রতিভাগুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।"

আপনার সম্মানে দেশের সকলেই সম্মানিত অনুভব করিতেছে। কেহ বলিতেছে, এই ব্যাপারে বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঙালী নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, আমাদের কবি-সংবর্দ্ধনার তরঙ্গ বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; আবার কেহ বলিতেছে, মহম্মদ মক্কার চেয়ে মদিনায় গিয়া বেশী সম্মানিত হইয়াছেন। এ সব বাহিরের কথা। এ ছাড়া, আমাদের পাঁচ সাত জনের ব্যক্তিগত একটি পরম লাভ হইয়াছে। আমরাও যে প্রকৃত সাহিত্যরসের আস্বাদ জানি এবং কবি ও অকবির প্রভেদ বুঝিতে পারি, তাহা ইংলণ্ডের সাহিত্যরসিকেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

Yeats, ··· Rothenstein প্রভৃতির আপনার কবিতার উপর ভক্তির কথা পড়িয়া অবধি আমার একটি কথা মনে হয়। মনে হয়, যে, গোত্রগত প্রাধান্য এবং কুলদেবতার সঙ্কীর্ণ পূজাবিধি উল্টাইয়া দিয়া, সাম্রাজ্য-সম্ভব সমন্বয় এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের, বিশ্বজনীন পূজাবিধি, যেমন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছিল, তেমনি, cultureএর আধার বড় বড় Idealist বা

কবিরাই বর্ত্তমানযুগের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, যুগধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মহামিলনের রাখীসূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতেছেন। ইহাতে যে বিশ্বজনীনতার সূত্রপাত হইতেছে তাহার তুলনায় বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদের এক এক মহাদেশ-ব্যাপী মিলন-সঙ্ঘ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র। হয় তো, আমার এই সিদ্ধান্ত ভুল; তবুও ইহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। সুবিধামত এ সম্বন্ধে একটু লিখিলে আনন্দিত হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

স্নেহার্থী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২

৪৬, মস্জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২০শে কার্ত্তিক ১৩১৯

শ্রীচরণেষু—

আপনার চিঠি দু'খানি যথাসময়ে পৌঁছেচে। 'কুহু ও কেকা' সম্বন্ধে আপনি যা' লিখেচেন তাতে আমি আপনার স্নেহেরই পরিচয় পেয়েছি। আশীর্ব্বাদের করুণ হস্তের স্পর্শই লাভ করেছি। আর আপনার কাছে এও আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হবে, যে, মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করেছি। ভাল লিখতে পারি বলে নয়,— বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির স্নেহ লাভ কর্ত্তে পেরেছি বলে।

যখন 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু'র জন্যে নানা দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করছিলুম তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোন ইংরেজী কি সংস্কৃত কবিতা পাই তা' হ'লে সেটিকে অনুবাদ ক'রে আমার বিশ্ব-কবিসভা উজ্জ্বল ক'রে তুলি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় আমার সেই মানসী কবি-সভায় একটি উচ্চতম আসনই শূন্য ফেলে রাখতে হ'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষুণ্ন বইটার খুঁৎ থেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখছেন; এই সময়ে যদি মৌলিক কোনো কবিতা,—অন্ততঃ Whitmanএর ধরণের গদ্য-কবিতা,— বাংলায় না লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'য়ে পড়ে, তবে সে লেখাটি যেন আমি একবার দেখ্‌তে পাই। তা'হলে আমায় অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর্ত্তে পারব।

কলেজ ছেড়ে পর্য্যন্ত ইংরেজীতে কাউকে চিঠি পর্য্যন্ত লিখিনি, নইলে আর এক রকমেও ঐ সাধটা মিটতে পারত। অন্ততঃ আপনার অমূল্য সময় এবং অনুবাদের শ্রম অনেক পরিমাণে বাঁচিয়ে দিতে পারতুম;—অবশ্য আমার নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধ্যের অনুপাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, artistic expression আয়ত্ত করা দূরে থাক, ইংরেজী রচনার Idiom পর্য্যন্ত একরকম ভুলেই গেছি। সুতরাং ইংরেজীতে কাব্যানুবাদের চেষ্টা, এখন আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।

সর্বশেষে আমার একটি নিবেদন আছে। য়ুরোপীয়েরা আমাদের আনন্দের অংশী হয়,—আমাদের কবির কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় এতে আমাদের একটুও হিংসা হবে না, বরং আনন্দই হবে। আর সেই অমৃতের আস্বাদ যত বেশী পায় ততই ভাল। কিন্তু আপনার অসুস্থ শরীরের কথাটাও একেবারে ভুললে চলবে না। ইতি

প্রণত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩

৪৬, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
১৯শে ডিসেম্বর ১৯১২

শ্রীচরণেষু—

"গীতাঞ্জলি"র ইংরাজীটি পেয়ে অনুগৃহীত হলুম। Nation, Times ও Atheneumএর সমালোচনাও দেখিচি।

'জলে না নাব্‌লে সাঁতার শেখা যায় না' আমাদের স্বদেশী নেতারা যখনই বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্যে সোরগোল সুরু করে থাকেন তখনই ঐ কথাটার উপরে বেশী করে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা, একসময়ে, আমারও খুব ভাল লাগ্‌ত এবং ঠিক বলেই মনে হ'ত। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, জলে নাবাটাও যেমন দরকারী, যে লোকটা সাঁতার শিখ্‌তে চাইছে তার ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্যের ওজন বোঝাটাও তেম্‌নি দরকারী।

আমাদের দেশে খবরের কাগজের অভাব নেই, কিন্তু সমঝ্‌দার সমালোচক কই? অবশ্য, সবাই যে Matthew Arnold হ'বে কি Walter Pater হ'বে তা' আশা করা যায় না; Creative Criticism করবার মত প্রতিভা চিরকালই দুর্লভ আছে এবং থাক্‌বে। কিন্তু যেটুকু উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছে স্বভাবতঃ আশা করা যেতে পারে তাই বা কই?

Nation বা Timesএ যাঁরা গীতাঞ্জলির সমালোচনা লিখেছেন তাঁরা কেউ Matthew Arnold নন্, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁদের মত লেখকই বা আমাদের দেশে কই? তাঁরা যে কথাটি বল্‌তে চেয়েছেন, তা' বেশ অনায়াসেই পরিষ্কার করে বল্‌তে পেরেছেন, যা' বুঝেচেন তা অপরকেও বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন; আমাদের সে সামর্থ্য কই?

আমাদের চেয়ে যে ওঁরা বেশী রসগ্রহণ করেছেন এ কথা আমি সহজে স্বীকার করতে পারি নে; কিন্তু যেটুকু পেয়েছেন সেইটুকুতেই মশ্‌গুল্ হ'য়ে উঠেছেন; সেটুকু এক্‌লা ভোগ করেন্ নি, সকলকে বেঁটে দিয়েছেন, এইটেই তাঁদের বিশেষত্ব, এইটেই গৌরব। ওখানকার তুলনায় আমাদের দেশে cultureএর হাওয়া বইছে না বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে ভাবের ব্যাপারীরা…নিজের নিজের পুঁজিটুকু নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছে; লেনাদেনা একরকম বন্ধ; কোনো কিছুই ফলাও হ'তে পাচ্ছে না; আড়ৎদার চিরকাল আড়ৎদারই থেকে যাচ্ছে; হৌস্‌ওয়ালা সওদাগর হ'তে পাচ্ছে না। ভারি Depressing.

আপনার শরীর এখন কেমন? ওদিকেও একটু নজর রাখতে হ'বে; এটি আমাদের সকলের অনুরোধ।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

স্নেহার্থী
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পুনশ্চ—

এবার মাঘোৎসবে আমরা আপনাকে লাভ করতে পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল।

৪

৭ই পৌষ
১৩২৫

শ্রীচরণেষু—

যেদিন জ্যোতির দীক্ষা
পেলেন পরম পুণ্যবান্
অন্তরের পদ্মদলে
আনন্দের পেলেন সন্ধান
সে অমৃত-সিক্ত দিনে
হে কবি! হে বিশ্বের আহ্লাদ!
পুণ্যহীন যাচে তব
পদধূলি আর আশীর্ব্বাদ।

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম তিনখানি পত্র ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাতপ্রবাসকালে লিখিত। এই সময় বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে-সমাদর হইয়াছিল চিঠিগুলিতে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। ২-সংখ্যক পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ যে অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ 'বিগত ইউরোপ-প্রবাসের সময় ইংরেজীতে একটি মাত্র মৌলিক গান রচনা করিয়াছেন তাহারই অনুবাদ "মণি-মঞ্জুষা"য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।'— দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, "মণিমঞ্জুষা" (১৯১৫), পৃ ৯৮, 'একটি গান'।

চতুর্থ পত্র বা কবিতা লিখিত হয় ৭ পৌষে মহর্ষির দীক্ষাদিনের স্মরণে।— মূল পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকখানি চিঠি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে— সেই সূত্রে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে তিনখানি পত্রের এ যাবৎ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও পুনর্মুদ্রিত হইল। 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' কবিতা-প্রসঙ্গে লিখিত প্রথম চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা প্রকাশের (১৯০৯, ১৩১৬) পূর্ববর্তী; রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে (পৃ. ৩৪৬-৪৭) মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চিঠিখানি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৯ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখের চিঠির উত্তরে লিখিত অনুমান হয়। ১৩৩৭ চৈত্র সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'সমালোচনার ধারা' নামে প্রকাশিত হয়। ছন্দ-প্রসঙ্গে লিখিত তৃতীয় পত্র রবীন্দ্র-রচনাবলী একবিংশ খণ্ড (পৃ. ৪৪১-৪২) হইতে গৃহীত।

১

বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে— বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে, ইহাই তাহার গর্ভবেদনা— এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে— যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখী হইয়া না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে— নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম— ইহা মুক্তির বেদনা— একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া-অবসান হইবে— 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে' কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি 'মুমুক্ষু'। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে— যদি অন্য কোনো সুশ্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চয়নিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়ো।

২

কল্যাণীয়েষু,

সত্যেন্দ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট। নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটা বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের। সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদি— তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। সেটুকুর মূল্য কেবলমাত্র আমার ঘরে পাঁচ-দশ জনের কাছে, কিন্তু বড়বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না— এই দৈন্যটি বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই।

তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবো না কেন?— কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন? যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই।·· প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা ত সাহিত্য-পথের মশাল নয়, এ কেবল চকমকি ঠোকা— ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট্ শব্দটাই বেশি। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয়? ইতি ২ মাঘ ১৩১৯।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে অন্যায় হবে না? আমার দৃষ্টিতে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তা হলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক নেই— ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ ক'রে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে— "কোথা জল, কোথা স্থল"— এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড় 'ল্' তত বড় নয়— সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল'কে একমাত্রা করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেই ত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে।

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল, যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তাহলে সম-অসমমাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted
Silence and tears

তাহলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In' টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফাল্‌তো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসনে ওর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

কাউণ্ট লিও টলস্টয়
১৮২৮ - ১৯১০

টলস্টয় ১৮২৮-১৯১০

টলস্টয়ের কাছে সাহিত্যসৃষ্টি ছিল গৌণ। মুখ্য ছিল সত্য কথা বলা ও সত্যভাবে বাঁচা। মিথ্যাকে তিনি বিষম ঘৃণা করতেন। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে। শেষবয়সে এটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। শুচিবাতিকের মতো সত্যবাতিক।

এর সূচনা প্রথম বয়সেই। উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তিনি মনে মনে সংকল্প করেন যে লেখনীর মুখে সত্য বলবেন। পূর্ণ সত্য। সত্য ব্যতীত আর কিছু নয়। সাক্ষীরা যেমন ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও এত কঠোর ছিল না। সত্য বলা একরকম চলে, কিন্তু পূর্ণ সত্য বলা আদৌ নিরাপদ নয়। সত্য ভিন্ন আর কিছু না বললে বড় বড় ব্যাপারে মৌন থেকে যেতে হয়।

ডায়েরিতে তিনি প্রাণ খুলে যা লিখেছিলেন তা প্রকাশের জন্যে নয়। এমন কি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির চোখে পড়বার জন্যেও নয়। তখনো তিনি জানতেন না যে পরে একদিন তিনি সাহিত্যিক হবেন বা বিয়ে করবেন বা তাঁর ডায়েরি স্ত্রীকে পড়তে দেবেন বা জগৎকে দেখতে দেবেন। জানলে হয়তো তাঁর হাত বেঁকে যেত। সত্য লিখলেও পূর্ণ সত্য লিখতেন না। সত্য ভিন্ন আর কিছু না লিখলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। একেই বলে অজ্ঞতা হচ্ছে আশীর্বাদ।

লিখতে লিখতে ক্রমে হাত খুলে যায়। বুঝতে পারেন যে তাঁর লেখার হাত আছে। তাঁর পিসিমা তাতিয়ানাও তাঁকে উৎসাহ দেন এই বলে যে, তাঁর যেমন কল্পনার দৌড়, কেন যে তিনি উপন্যাস লেখেন না এটা আশ্চর্য। কিন্তু হাজার লিপিকুশলতা ও কল্পনাশক্তি থাকলেও মহান লেখক তিনি হতেন না। তেমন প্রতিভাও তাঁর ছিল না। হলেন তা হলে কোন্ মন্ত্রবলে? সত্যভাষণের সাধনাবলে। সত্যভাষণ হল এমন এক ডিসিপ্লিন যার কল্যাণে ক্ষুদ্রও মহান হতে পারে। তবে মহান শিল্পী হবে কি না নির্ভর করছে আরো একটা উপাদানের উপরে। কেউ যদি অসার জীবন যাপন করে তবে তার সেই অসার উপলব্ধি দিয়ে মহান সৃষ্টি হবে কী করে, লিখলই বা সে প্রাণ খুলে সত্য কথা, পুরো সত্য কথা, সত্য ভিন্ন আর কোনো কথা নয়।

সার অভিজ্ঞতার উপরে টলস্টয়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পাঁকে ডুবে থাকলেও পঙ্কজকে তিনি ভোলেন নি। সত্যকে তিনি কোথায় না অন্বেষণ করেছেন! অস্থানে কুস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আরণ্যকদের মধ্যে, অভিজাত-মহলে, কৃষক-সংসর্গে, বন্যপ্রাণী-মৃগয়ায়, বেদে-বেদেনীদের সান্নিধ্যে। লিখতে বসে সব অভিজ্ঞতাই তাঁর কাজে লেগে গেল। কিন্তু যার জন্যে তিনি টলস্টয় তা হচ্ছে যুদ্ধের ভিতরকার সার সত্যকে মোহমুক্ত ভাবে দেখা ও দেখানো। তাকে রোমান্টিক করতে গিয়ে অসত্য করে না তোলা। যুদ্ধবিষয়ক রিপোর্টে বা রচনায় কেউ সত্য কথা লেখে না। ঘটনা ঘটে যাবার পর রটনায় পল্লবিত হয়। ঐতিহাসিকরাও সেই রটনার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করতে জানেন না। সত্য এমন লজ্জাকর বা জঘন্য যে তাকে ইচ্ছা করে বিকৃত করা হয়। পরম কাপুরুষও পরম বীর বলে পরিচিত হয়। ঘোড়া হয়তো প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বীর ভাবছেন

তিনিই তাকে রাশ ধরে চালাচ্ছেন। ঘটনা হয়তো আপনি ঘটে যাচ্ছে। সেনাপতি ভাবছেন তাঁর আদেশে ঘটছে। গৌরবের জন্যে বানানো গল্পও সত্য বলে প্রচলিত হয়। টলস্টয় এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

"সমর ও শান্তি" লিখে টলস্টয় বহুলোকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বছর পাঁচেক লাগল ও-বই লিখে শেষ করতে ও আরো বছর দশেক স্বদেশের স্বীকৃতি পেতে। এর পরে তিনি যা নিয়ে লেখেন সেও এক বিপজ্জনক বিষয়। নরনারীর সাজানো সংসারে স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্যাশন। যতক্ষণ নীতির সীমার মধ্যে থাকে। যখন সীমার বাইরে চলে যায়। "আনা কারেনিনা" তখনকার দিনে এক দুঃসাহসিক কীর্তি। টলস্টয় যাকে নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ মনে করেছিলেন একালের বিদগ্ধ পাঠক তাকে বলবেন সংস্কার সংসার ও সমাজবিধির সঙ্গে সংঘাত। আনা এমন কোনো চিরন্তন মহাপাতক করেনি যার জন্যে অত বড় একটা শাস্তিই ছিল তার নিয়তি। তা সত্বেও তার কাহিনীতে নিত্যকালের ট্র্যাজেডির উপাদান, ছিল। প্রেমিকের একনিষ্ঠতায় সন্দেহ। তাই ও-বই শিল্পলক্ষ্যভ্রষ্ট নীতিগ্রন্থ হয় নি। অপর পক্ষে নীতিনিরপেক্ষ বাস্তববাদী চিত্রকর্মও নয়। সত্যের অন্বেষক অত সহজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এইখানে সমসাময়িক ফরাসী কথাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা। পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গেও।

তাঁর ওই দুখানি মহা-উপন্যাস মহাকাব্যজাতীয়। বলা যেতে পারে একালের মহাভারত ও রামায়ণ। অবশ্য অন্যপ্রকার। মানুষের জীবনে নিয়তির হাতই তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই মানুষকে ক্ষমাযোগ্য করেছেন। এক নেপোলিয়ন বাদে অমার্জনীয় কেউ নয়। যারা নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, অথচ নিয়তির দ্বারা চালিত হয় তাদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। কিন্তু মন্দ মানুষকে বা মন্দকারীকে ভালোবাসেন বলে তিনি মন্দকে ভালো বলেন না। মন্দত্বের প্রতি তাঁর লেশমাত্র সহানুভূতি নেই। এইখানেও তাঁর সঙ্গে তাঁর বাস্তববাদী সহযোগী ও পরবর্তীদের প্রতিতুলনা। ভালো আর মন্দকে তিনি যেমন শাদা আর কালোর মতো স্বতোবিরুদ্ধ মনে করতেন একালের বিদগ্ধ সাহিত্যিকরা তেমন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে ভালোমন্দ একাকার বা অনুপস্থিত। সত্য অনেক সময় ভালোমন্দের অতীত। সত্য শুধুমাত্র সত্য। ভালোও নয়, মন্দও নয়। সর্ববিশেষণবর্জিত।

গোড়াতেই বলেছি যে সাহিত্যসৃষ্টি টলস্টয়ের কাছে গৌণ ছিল। ইংরেজরা যেমন বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য লাভ করে তিনিও তেমনি ডায়েরি লিখতে গিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। বছর পঞ্চাশ বয়সে কীর্তির ও যশের ও বিত্তের শিখরে উঠে কোথায় তিনি আনন্দ করবেন, তা নয়। চাইলেন সত্যভাবে বাঁচতে। জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করতে। প্রথমে তাঁর আপনার। পরে তাঁর স্বদেশের ও স্বকালের। জীবনজিজ্ঞাসা বরাবর তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। অল্প বয়স থেকেই তিনি জীবন মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর ও অমরত্ব নিয়ে চিন্তাকুল। বাণপ্রস্থের বয়স যখন হল তখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে পরমার্থে মন দিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এটা মস্ত বড় একটা লোকসান। কি রাশিয়ায় কি অন্য দেশের কথাশিল্পে "আনা কারেনিনা-র পরে আর ক্লাসিক লেখা হল না। হতে পারত যদি টলস্টয় মন খোলা রাখতেন। কিন্তু মনটা হল তাঁর দায়বদ্ধ। আত্মোদ্ধারের দায়। মানব উদ্ধারের দায়। সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে হিংসার হাত থেকে, অসত্যের হাত থেকে। তার জন্যে সত্যভাবে বাঁচতে হবে।

বিশেষ করে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে বিপ্লবের হাত থেকে, যুদ্ধের হাত থেকে। এমনি গভীর ছিল তাঁর ইতিহাসদৃষ্টি যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিপ্লব আসছে, যুদ্ধ আসছে।

বাইবেলে আছে পয়গম্বর নূ (Noah) আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মহাপ্লাবন আসছে, সৃষ্টি লুপ্ত হবে। তাঁর স্ত্রীকে সে কথা বলায় ভদ্রমহিলা বিশ্বাসই করলেন না। টলস্টয়ের পরিবারেও সেই পুরাণবর্ণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল। টলস্টয় উঠে-পড়ে লেগে গেলেন জীবনযাত্রার ধরনধারন বদলাতে ও শোধরাতে। যাদের পিঠে চড়ে বসেছেন তাদের পিঠ থেকে নামতে। চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাদেরই একজন বনে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কে একজন গান্ধী পর্যন্ত তাঁর কথা শুনে তাঁর অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের গৃহিণীর কানে একটি কথাও গেল না। যুদ্ধ আর বিপ্লব দুই দেখতে বেঁচে রউলেন কাউণ্টেস। টলস্টয় বেঁচে গেলেন তার আগে মরে।

যুদ্ধ আর বিপ্লবের মতো মৃত্যু ছিল তাঁর আর-এক ধ্যান। সত্যভাবে বাঁচলে যুদ্ধ ও বিপ্লব এড়ানো যায়, মৃত্যু অনিবার্য। তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর এই নিয়েও মেঘলা ছিল। জীবনের অর্থের জন্যে তিনি খ্রীস্টমার্গে বিশ্বাসী হন। কিন্তু প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে তাঁর ঘোর অনাস্থা। পেছিয়ে যেতে যেতে তিনি চলে গেলেন যীশুখ্রীস্টের জীবনকালে। আদি খ্রীস্টবচনই হল তাঁর ধর্ম। শোষণ ও হিংসার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে বেধেছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত। এবার বাধল খ্রীস্টমার্গচ্যুত চার্চের সঙ্গে। একা টলস্টয় লড়তে লাগলেন দুই মহাশক্তির সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে। চার্চের সঙ্গে। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা বড় কম। বলা বাহুল্য মিলটনের মতো টলস্টয়ও লেখনীকে তরবারি করেছিলেন। খরধার তরবারি। কিন্তু মিলটনের পিছনে সম্প্রদায় ছিল। টলস্টয় সম্পূর্ণ একলা। দানবের বল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। দানবও ছিলেন প্রথম যৌবনে। সেই বলের যেই সদ্ব্যবহার হল অমনি তাঁরও রূপান্তর ঘটল। তিনি হলেন মহামানব। যে হাতে কলম সেই হাতে বন্দুক ছিল একদা। বন্দুক গেল। তার বদলে এল চাষী ও মুচির হাতিয়ার। মদ্য মাংস ইত্যাদি পঞ্চ ম-কার গেল। রাজসিক হলেন সাত্ত্বিক। কিন্তু সব পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি যোদ্ধা। বার্ধক্যে তাঁর যুদ্ধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, চার্চের বিরুদ্ধে।

সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, ঠিক। কিন্তু লাভবানও হল। কারণ তাঁর শেষবয়সের লেখা গল্পগুলি নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক বলে বিস্মরণীয় নয়। শিল্পীসুলভ চাতুরী তিনি ষষ্ঠ ম-কারের মতো বর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও— বোধহয় সেইজন্যেই— "আইভান ইলিচের মৃত্যু", "প্রভু ও ভৃত্য" প্রভৃতি কাহিনীগুলি অন্তরকে উদ্বেল করে, সারা জীবন মনে থাকে, অলক্ষিতে জীবনকে বদলে দেয়। কী করে বলি যে এসব আর্ট নয়? হাঁ, এগুলিও আর্ট। তবে এই একমাত্র আর্ট নয়। টলস্টয় বললেও না। অপর পক্ষে "সমর ও শান্তি"ও আর্ট। "আনা কারেনিনা"ও আর্ট। টলস্টয় না বললেও আর্ট। শেষের দিকে তিনি "দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন" হয়েছিলেন। তাই নিজের কীর্তিকেও ভস্ম করতে না চান, ছাইভস্ম মনে করেছিলেন। এটাও একপ্রকার শুচিবাতিক। কিন্তু এর আরো একটা কারণ আছে। সেটা আরো গভীর।

নিজের পূর্বজীবনকে কাটিয়ে ওঠা এক কথা। তাকে খারিজ করা অন্য জিনিস। তিনি কাটিয়ে উঠে ক্ষান্ত হবেন না। সরাসরি খারিজ করবেন। যেহেতু রিপুর তাড়নায় অনেকগুলো পাপ করে ফেলেছিলেন। না জেনে কারো কারো সর্বনাশও। অনুতাপ তাঁর মতো আর কে এত করেছে! দুনিয়াকে নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটির কথা কে এমন নির্মম ভাবে শুনিয়েছে! ডায়েরিও প্রকাশ করা হল তাঁর ইচ্ছায়। তবে পরিবারের মুখ চেয়ে কতক বাদসাদ দিয়ে। লোকে তাঁকে জুতো মারুক, এই তিনি চেয়েছিলেন। ভাবীকাল তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। তিনি সত্যকুলজাত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

রুশ ভাষায় লেভ্ মানে সিংহ আর টলস্টয় মানে বিশালবপু। টলস্টয়ের পূর্বপুরুষরা সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাঁদের বংশের ইতিহাস খুঁজেছিলেন। সেই সন্ধান অনুযায়ী ইন্দ্রোস নামে এক ব্যক্তি ১৩৫৩ সালে দুই ছেলে আর তিন হাজার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জার্মানি থেকে চলে আসেন রাশিয়ায়। ইন্দ্রোসের পৌত্র আন্দ্রেই হেরিংটনোভিচ মস্কোয় বসবাস শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে ভাব ছিল মস্কোর রাজকুমার ভাসিলি ভাসিলিয়েভিবের। রাজকুমার নাকি তাঁকে টলস্টয় বা বিশালবপু বলে ডাকতেন। তা থেকেই তার পরিবার এমন-কি বংশধররা পর্যন্ত হয়ে যান টলস্টয়। পরবর্তী গবেষণায় অবশ্য ইন্দ্রোসের বৃত্তান্ত অলীক প্রমাণ হয়েছে, তবে পদবীর ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত বোধ হয় এখনো বদলায় নি। রাষ্ট্রীয় টলস্টয়-মিউজিয়মের গাইডদের কথায়ও তাই মনে হয়।

টলস্টয়-অনুরাগীদের সৌভাগ্য, তাঁর অনেক জিনিস সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত মস্কোর রাষ্ট্রীয় টলস্টয়-মিউজিয়মের সংগ্রহশালা—যা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে সোভিয়েট আমলে— একেবারে শিশু টলস্টয়ের নানা জিনিসও বাঁচিয়ে রেখেছে। একটি ছোট্ট খাতা আছে, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা গ্র. ল. নি. ট. (গ্রাফ লেভ নিকলায়েভিব্ টলস্টয়)। এই বোধ হয় টলস্টয়ের সবচেয়ে পুরনো সই যা সংগৃহীত হয়েছে। টলস্টয়ের বয়স তখন সাত। খাতাটা হচ্ছে প্রকৃতিপাঠের খাতা। তাতে লেখা আছে—

ঈগল পাখি

'ঈগলপাখি, পাখিদের রাজা। শোনা যায়, একটি ছেলে নাকি একবার ঈগলপাখির পিছনে লেগেছিল। ঈগলপাখি তখন তার উপর রেগে গিয়ে তাকে ঠুকরে দিয়েছিল।'

আরো কিছু পরের একটি খাতায় দেখা যায় 'দিন' 'হেমন্ত' 'বসন্ত' 'রাত্রি' 'আগুন' 'ক্রেমলিন্' 'পম্পেই' প্রভৃতি নিয়ে টলস্টয় রচনা লিখছেন। সে সবই তাঁর ভাষাচর্চার পাঠ।

এগারো বছর বয়স থেকে টলস্টয় কবিতা লিখতে শুরু করেন। সংরক্ষিত প্রথম কবিতাটি বারো বছর বয়সে লেখা। নাম 'আদরের পিসিমাকে'; পিসিমা হলেন ইয়েগ্রল্স্কায়া। টলস্টয়ের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। তবে টলস্টয়দের সঙ্গেই থাকতেন। টলস্টয়ের ছোটবেলাকার পড়াশুনোর ভার অনেকটা তাঁর উপরেই ছিল। কবিতাটিতে টলস্টয় ইয়েগ্রল্স্কায়াকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, শুভকামনা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতা পড়ে সাঁ তমাস নামে টলস্টয়ের ফরাসীভাষার শিক্ষক প্রশংসা করে এক চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'কবিতাটি আমার এত ভালো লাগে যে রাজকুমারী গর্চাকোভাকেও পড়ে শোনাই…আমাদের একান্ত অনুরোধ এ কাজে [কবিতা লেখায়] তুমি ছেদ দিয়ো না।…'

টলস্টয় ষোলো বছর বয়সে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তারও কিছু কাগজপত্তর রাখা আছে। গাইড জানালেন এক পরীক্ষায় টলস্টয় খুবই খারাপ করেন অধিকাংশ বিষয়েই। ভূগোলে পেয়েছিলেন পাঁচে এক। টলস্টয় পরে তাঁর জীবনীকারকে বলেছেন— 'মনে আছে ফ্রান্সের বিষয়ে প্রশ্ন

ছিল। মুসিন-পুশ্‌কিন ছিলেন পরীক্ষক। তিনি আমাদের বাড়ির চেনা লোক। তাই আমায় বাঁচাবার জন্যেই বলেন— "ফ্রান্সের সাগরতীরের কয়েকটি শহরের নাম করো!" একটা নামও বলতে পারি নি।'

ছাত্রাবস্থাতেই টলস্টয় জমিদারির কাজকর্ম দেখাশুনো শুরু করেছিলেন। সে সময়ের দুটি বড় খাতায় টলস্টয়ের লেখা জমিদারি-সংক্রান্ত হিসেবপত্র রাখা আছে। তাতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মত টলস্টয়ও শুধু সাহিত্যসেবা নয় বিষয়কর্মেও নিপুণ ছিলেন। এই সময়ই টলস্টয় একবার তাঁর পাশের জমিদারের এক এস্টেটে যান বিখ্যাত তিরোলী বাছুর কিনতে। রাতটা তাঁকে সেখানেই কাটাতে হয়। শুতে যাবার সময় টলস্টয় দু-চার লাইন কিছু পড়ার জন্য হাতের কাছে যা বই পান টেনে নেন। বিছানায় শুয়ে বইটা খুলে দেখেন— কবিতা। পড়তে পড়তে পুরোটাই পড়ে ফেলেন। তার পর আবার গোড়া থেকে শুরু করেন। ঐ করেই ভোর হয়ে যায়। বইটা ছিল পুশ্‌কিনের য়েভগেনি ওনেগিন।

সোভিয়েত দেশে টলস্টয় সংক্রান্ত চারটি মিউজিয়ম। এতক্ষণ যেটির কথা বলছিলাম তাকে বলা যায় হেড্ আপিস। ইয়াসগায়া পলিয়াগা, লেভ্ টলস্টয় রেলওয়ে স্টেশন, আর মস্কোরই লেভ্ টলস্টয় স্ট্রীটে টলস্টয়ের আবাসগৃহটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সবই করেন ক্রপোৎকিন্‌স্কায়ার এই মিউজিয়মটি। এই চারটি মিউজিয়মে প্রায় দশ লাখ জিনিস আছে। ক্রপোৎকিন্‌স্কায়া স্ট্রীটের রাষ্ট্রীয় মিউজিয়মের ন'টি ঘর সাজানো হয়েছে অনেকটা এই পর্যায়ে: শৈশব ও কৈশোর, টলস্টয় সেভাস্তোপোলে, টলস্টয় ও সভ্রেমেন্নিক পত্রিকা এতেই তিনি লিখতে শুরু করেন ('সমর ও শান্তি' উপন্যাস, আন্না কারেনিনা, রেজারেকশন্) সোভিয়েট দেশে টলস্টয়ের উত্তরাধিকার, টলস্টয়ের বিষয়ে লেনিন ও স্টালিন। এই কয়টি ঘরে টলস্টয়ের রচনাবলীর সবরকম সংস্করণ ও অনুবাদ, তাঁর ব্যবহৃত বহু বই ও পত্রিকা, তাঁর বিষয়ে নানা রচনা, মূর্তি, ফোটো, ছবি, টলস্টয়ের কথার রেকর্ড, মুভি-ফিল্‌ম্ প্রভৃতি আছে। বরিস পাস্তেরনাকের বাবার আঁকা টলস্টয়ের কয়েকটি প্রতিকৃতিও এখানে আছে।

টলস্টয়ের পাণ্ডুলিপি এখানে যা আছে তা যোলো হাজার পাতারও বেশি। সমর ও শান্তিরই প্রায় ৫০০০ পাতা, আন্না কারেনিনার ২৫০০, রেজারেকশনের ৭০০০। টলস্টয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময় ছিল তাঁর সময়ের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির, যেমন, তুর্গেনেভ, রেপিন— যাঁর আঁকা টলস্টয়ের কয়েকটি সুন্দর ছবি আছে এই মিউজিয়মে— গর্কি, চাইকভস্কি, চেখভ, রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি। গান্ধীজীর উল্লেখ টলস্টয়ের লেখায় প্রথম পাই তাঁর দিনপঞ্জীতে, ১৯ মার্চ ১৯১০ তারিখে। টলস্টয় লিখছেন, 'ভারতীয়কে লেখা আমার চিঠিটা পড়লাম। ভালো হয়েছে।' তার এক মাস পর আবার লিখছেন, 'সন্ধ্যাবেলা সভ্যতার বিষয়ে কান্দির লেখাটা পড়লাম। খুবই ভালো লেখা।' তখনো যে গান্ধী নামটা তাঁর তেমন পরিচিত নয়, তা বোঝা যায় বানানের ঐ ভুলটা দেখে। আরো মাসখানেক পরে লিখছেন, 'Gandhiর বিষয়ে বইটা পড়লাম। খুবই প্রয়োজনীয়।' বইটি হল জোসেফ ডোক-এর লেখা *M. K. Gandhi, An Indian Patriot in South Africa*। টলস্টয় তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী চের্ৎকভ্‌কে লিখছেন (যাঁকে টলস্টয়পত্নী মোটে সহ্য করতে পারতেন না, টলস্টয়ের জীবনের শেষ পর্বের দাম্পত্য অশান্তির মূলে অনেকটা রয়েছে চের্ৎকভের প্রতি সোফিয়া আন্দ্রেইয়েভনার অহেতুক বিরাগ), 'এখনই আর কাল সন্ধ্যায় পড়লাম, আমার কাছে চিঠিসুদ্ধ পাঠানো দুটি বই (একটি *M. K. Gandhi, An Indian Patriot*, অন্যটি *Indian Home*

Rule)· ·তাঁর একটি ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে Passive Resistanceএর পথে সংগ্রামী গান্ধীর লেখা।· ·তাঁর ইণ্ডিয়ার হোম-রুল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে। আমার মত জানতে চেয়েছেন [গান্ধী]। তাঁকে চিঠি লিখতে আমি খুবই ব্যগ্র।'

টলস্টয়ের চিঠিপত্রের সংকলনটি বিরাট। সংরক্ষিত চিঠির মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। উপর-উপর চোখ বোলাতে দেখা গেল বিখ্যাত রুশ কবি শেভকে টলস্টয় সমর ও শান্তি বইটির বিষয়ে লিখছেন, 'এই হেমন্তে আমার উপন্যাসের অনেকটা লিখেছি। Ars longa, vita brevis, এ কথাটাই সারাদিন মনে পড়ে।'· · এ সময়েই আবার একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান হাতটাই ভাঙে। বিরাট উপন্যাসের প্রেরণা রয়েছে মনে। সেই সঙ্গে ভয়, হয়তো তা শেষ করে যেতে পারবেন না। এমন সময় এই বিপত্তি। তর না সওয়ায় মুখেই বলে যেতে থাকেন। সমর ও শান্তি উপন্যাসটিকে সে-সময় টলস্টয় তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করতেন। যখন কোনো অংশ লিখে সন্তুষ্ট হতেন তখন বাড়ির লোকেদের বলতেন 'আজ আমার প্রাণের কিছু অংশ রেখে দিয়ে এসেছি ঐ দোয়াতদানিতে।' ক্রপোকিনস্কায়া স্ট্রিটের মিউজিয়মের ছ'নম্বর ঘরটিতে রয়েছে এই উপন্যাসটি সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস। তার মধ্যে আছে কয়েকজন লোকের ছবি যাঁরা বস্তুতঃ সমর ও শান্তি উপন্যাসটির কোনো কোনো চরিত্র। যেমন কাউণ্ট রস্তোভের অন্তরালে আছেন টলস্টয়ের ঠাকুর্দা কাউণ্ট ইলিয়া আন্দ্রিয়েভিচ টলস্টয়। সিনিয়র প্রিন্স্ ভল্‌কন্‌স্কি হলেন লেখকের দাদামশায় নিকলাই সের্গিয়েভিচ ভল্‌কন্‌স্কি। নিকলাই রস্তোভ হলেন টলস্টয়ের বাবা। তেমনি প্রিন্সেস মারিয়া হলেন টলস্টয়ের মা। আন্দ্রেই ভল্‌কন্‌স্কির মডেল হলেন টলস্টয়ের সহোদর সের্গেই নিকলায়েভিচ টলস্টয়। নাতাশা রস্তোভায় চিত্রিত হয়েছেন প্রধানত টলস্টয়ের শ্যালিকা তাতিয়ানা আন্দ্রেইয়েভ্‌না বের্স।

চিঠির সূত্রেই সমর ও শান্তির কথা এল বলে গাইড জানালেন, 'দুঃখের বিষয় টাগোরের সঙ্গে টলস্টয়ের পরিচয় হয় নি। কারণ টাগোর ইয়োরোপে পরিচিত হবার আগেই টলস্টয় মারা গেছেন। তবে টাগোরের চিঠিও আমাদের সংগ্রহে আছে।' সে চিঠি লেখা রবীন্দ্রনাথের মস্কো-সফরের সময়ে। শারীরিক অসুস্থতাবশত টলস্টয়-মিউজিয়ম দেখা হল না বলে তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এই মিউজিয়মটির চার পাশে যে উঠোন আছে তারই এক দিকে একটি বাড়ি দেখিয়ে গাইড জানালেন ওখানে টলস্টয়ের এককালের সেক্রেটারি নিকলাই গুসেভের বাস। গুসেভ টলস্টয়ের প্রামাণিক জীবনী-রচয়িতা হিসেবেও খ্যাত। শুনলাম এখনো তিনি সে কাজ নিয়েই ব্যস্ত। শীঘ্রই তাঁর রচিত টলস্টয় জীবনীর আর-একটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। কথাপ্রসঙ্গে গাইড জানালেন, টলস্টয়-সদন শুধু সংগ্রহশালাই-নয়; এখান থেকে টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক রচনাও প্রকাশিত হয়; দেশ-বিদেশের নানা গবেষককে তথ্য জুগিয়ে সাহায্য করা হয়।

শুভময় ঘোষ

টলস্টয়-গান্ধী পত্রাবলী

মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মচরিতে আধুনিক কালের তিনজন মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের জীবন বা রচনা তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে— এই তিন জনের অন্যতম টলস্টয়। তাঁর *The Kingdom of God is within You* পড়ে গান্ধীজি 'অভিভূত' হয়েছিলেন—'এই বই আমার জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে'। ক্রমশঃ গান্ধীজি টলস্টয়ের *The Gospel in Brief, What to Do* ও অন্যান্য গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। গান্ধীজির জীবন ও কর্মের ধারা যে পথে চলেছিল টলস্টয়ের রচনায় তার সমর্থন লাভ করে গান্ধীজি টলস্টয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, টলস্টয়কে তাঁর অন্যতম গুরু বলে উল্লেখ করেছেন; দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহীদের আশ্রয়ভূমি টলস্টয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, টলস্টয়কে চিঠি লিখে গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ-সংবাদ নিবেদন করেন, টলস্টয়ও গান্ধীজির চিঠি ও রচনা পড়ে প্রীতিলাভ করেন ও উৎসাহিত বোধ করেন। উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়েছিল তার কয়েকটি নিদর্শনের মর্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হল; অন্যান্য চিঠিপত্র ও আনুষঙ্গিক উপকরণ শ্রীকালিদাস নাগ -সংকলিত *Tolostoy and Gandhi* পুস্তকে মুদ্রিত আছে। শ্রী ডি. জি. টেণ্ডুলকর -লিখিত *Mahatma* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গান্ধীজি ও টলস্টয়ের কয়েকখানি চিঠির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে।

—

টলস্টয়ের প্রতি গান্ধীজি

১

Westminster Place Hotel
4 Victoria Street,
London, S. W.
1st October, 1909

বছর তিনেক ধ'রে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে যা ঘটে চলেছে তার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই।

এই উপনিবেশে প্রায় তেরো হাজার ভারতীয় প্রজার বাস। এরা বহুকাল ধরে নানা আইনগত অসুবিধার মধ্যে জীবন নির্বাহ করে চলেছে। বর্ণবিদ্বেষ, কোনো কোনো ব্যাপারে এশিয়াবাসীর প্রতি বিদ্বেষ এখানে অত্যন্ত তীব্র। এশিয়াবাসীর ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষের বড় কারণ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। তিন বছর আগে একটি আইনের ফলে অবস্থা চরমে পৌঁছয়। আমার ও অন্য অনেকের ধারণা এই আইন অবমাননাকর, যাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য তাদের মনুষ্যত্বহীন করবার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা-প্রসূত এই আইন। আমি মনে স্থির জেনেছি যে এ ধরণের আইনের কাছে নতিস্বীকার সদ্ধর্মোচিত নয়। আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু সহিংস সংঘাতের বিরোধী মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস আমাদের

এখনও অটুট। আপনার রচনা পাঠ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তা আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানকার ভারতীয়দের কাছে সকল অবস্থা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার পর তারা একমত হয়েছে যে এই আইনের কাছে নতিস্বীকার করা অকর্তব্য— এই আইনভঙ্গের ফলে কারাদণ্ড বা অন্য যে-কোনো শাস্তি নির্দিষ্ট হয় তাই স্বীকার্য। ফল হয়েছে এই যে প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ভারতীয় সংগ্রামের তাপ বা কারাবাসের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে গিয়েছে তবু যে-আইনকে তারা অসম্মানজনক বলে জানে তার কাছে নত হয় নি। যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী বিবেকের নির্দেশে স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড স্বীকার করেছে। কেউ কেউ পাঁচবার পর্যন্ত কারাবরণ করেছে। চারদিন থেকে ছ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সশ্রম। অনেকের আর্থিক দুর্গতির চরম হয়েছে। বর্তমানে ট্রান্সভালের বিভিন্ন দেশে শতাধিক সত্যাগ্রহী রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত দরিদ্র, দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার ফলে সাধারণের দানের উপর নির্ভর করে তাদের স্ত্রীপুত্রদের ভরণপোষণ করতে হচ্ছে; এবং সত্যাগ্রহীদের ভিতর থেকেই সে চাঁদার বেশির ভাগ আদায় করতে হয়েছে। এতে ভারতীয়দের উপর কষ্টের চাপ আরও বেড়েছে; তবু আমি বলব তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লড়াই এখনও চলছে, কবে শেষ হবে কে বলতে পারে। আমরা এটা স্পষ্ট দেখেছি যে যেখানে পশুশক্তি হার মানে সেখানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সফল হতে পারে, আর তা হবেই। আমরা এও লক্ষ্য করছি যে প্রধানতঃ আমাদের দুর্বলতার জন্যই কোনো কোনো স্থানে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ছে— ফলে সরকারের মনে এই ধারণা গড়ে উঠছে যে আমরা দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট সহ্য করে যুঝতে পারব না।

একজন বন্ধুকে নিয়ে রাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে ও সমস্যার সমাধানকল্পে সকল ঘটনা তাদের কাছে পেশ করতে আমি এখানে এসেছি। সত্যাগ্রহীদের বিশ্বাস সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অনাবশ্যক। তবুও দলের দুর্বল অংশের প্ররোচনায় এই ডেপুটেশন এসেছে; এতে আমাদের শক্তির চেয়ে দুর্বলতাই প্রকট হচ্ছে বেশি। এখানকার ব্যাপার দেখেশুনে আমার ধারণা হচ্ছে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নৈতিকতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে আমাদের আন্দোলনের খবর আরও ছড়িয়ে পড়বে, মানুষ এ নিয়ে ভাবতে শুরু করবে। জনৈক বন্ধু প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন। তিনি মনে করেন এ-জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন অসহযোগের মূলধর্মের সঙ্গে অসংগত। এ যেন মত ক্রয় করার মতো হবে। এই নৈতিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে আপনার অভিমত জানতে পারি কি? আপনি যদি মনে করেন এ-জাতীয় রচনা আহ্বানে কোনো দোষ নেই তবে বিশেষ করে কাদের কাছে রচনার জন্য অনুরোধ জানাব অনুগ্রহ করে এমন কয়েকটি নাম আমাকে পাঠাবেন।

আর একটি প্রসঙ্গে আপনার কালহরণ করতে চাই। আমার এক বন্ধুর মারফত ভারতের বর্তমান অশান্তি প্রসঙ্গে 'একজন হিন্দু'র কাছে লেখা আপনার পত্রের একটি কপি আমার হাতে এসেছে। দেখে মনে হয় এতে আপনার মতামত ব্যক্ত হয়েছে। আমার বন্ধুবরের অভিপ্রায় তাঁর ব্যয়ে এই পত্র কুড়ি হাজার কপি ছাপিয়ে বিতরণ করা হোক। তিনি এর অনুবাদেও আগ্রহী। আমরা মূল রচনাটি সংগ্রহ করতে না পারায় এটা আপনারই পত্র কিনা না জেনে এবং এই কপির নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

না হয়ে ছাপতে পারি না। সেই কপির একটি প্রতিলিপি এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে জানাবেন এটা আপনারই রচনা কিনা এবং এর পাঠ নির্ভুল কিনা। আমাদের প্রস্তাবে আপনার সম্মতি আছে কিনা তাও অনুগ্রহ করে জানাবেন আশা করি। এই পত্রে যদি আর কিছু যোগ করতে চান দয়া ক'রে করে দেবেন। আমার একটি নিবেদন— অন্তিম অনুচ্ছেদে আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস থেকে পাঠককে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। আমি জানি না আপনি এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন কিনা (আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন)। পুনর্জন্মবাদে ভারত ও চীনের কোটি কোটি মানুষের চিরলালিত বিশ্বাস। অনেকের কাছে এটা কেবল তাত্ত্বিক বিশ্বাস মাত্র নয়, অভিজ্ঞতাজাত প্রত্যয়। জীবনের বহু রহস্যের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়। ট্রান্সভালে যারা কারাদণ্ড ভোগ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেরই এই বিশ্বাসই পরম সান্ত্বনা। আমি আপনাকে ওই মতবাদে আস্থাশীল হবার জন্য লিখছি না, আমি কেবল যেখানে আপনি নানা বিষয়ে পাঠককে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন সেখান থেকে 'পুনর্জন্ম' শব্দটি বাদ দিয়ে দেবেন এই অনুরোধ করব। আপনার পত্রে আপনি বহুস্থানে কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং শ্লোকের উল্লেখও করেছেন। কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে তার নামটি জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনি এই দীর্ঘ পত্রে ক্লান্তিবোধ করবেন। আপনাকে যারা শ্রদ্ধা করে এবং আপনাকে অনুসরণ করতে চায় আপনার সময় নষ্ট করার কোনো অধিকার তাদের নেই তা আমি জানি। যতদূর সম্ভব আপনাকে কোনো কষ্ট না দেওয়াই তাদের অবশ্য কর্তব্য। তথাপি, আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও, কেবল সত্যের অনুসন্ধিৎসায় আপনাকে পত্র লিখছি, এবং যে সকল সমস্যা সমাধান আপনার জীবনের ব্রত সে বিষয়েই আপনার উপদেশ প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধাসহ
আপনার অনুগত
মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজির প্রতি টলস্টয়

২

Yasnaya Polyana
October 7, 1909

এইমাত্র আপনার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ আনন্দলাভ করলাম। ঈশ্বর আমাদের ট্রান্সভালের সকল ভাই ও সহকর্মীদের মনে শক্তিসঞ্চার করুন। পাশবিক শক্তি ও মানবিক শক্তির মধ্যে এই যে সংগ্রাম এর এক দিকে প্রেম ও নম্রতা, অপর দিকে শঠতা ও হিংসা। এ সংগ্রাম আমাদের চিত্তেও অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়েছে— বিশেষতঃ যেখানে সামরিক চাকুরি গ্রহণে বিবেকের অসম্মতিতে সরকারী আইন ও ধর্মীয় আনুগত্যের ভিতর তীব্র সংঘর্ষ বেধেছে। এ-জাতীয় অসম্মতি প্রায়ই দেখা দিচ্ছে।

"A Letter to a Hindu" আমারই রচনা। ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য খুব খুশি হয়েছি। কৃষ্ণ সম্পর্কে গ্রন্থের নাম মস্কো থেকে আপনাকে জানিয়ে দেবে। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আমার দিক দিয়ে কিছুই বাদ দিতে চাই না। কারণ আমার ধারণা পুনর্জন্মে বিশ্বাস কিছুতেই মানবচিত্তে আত্মার অবিনশ্বরতা এবং

ভগবৎপ্রেম ও সত্যে বিশ্বাসের মতো গভীর রেখাপাত করতে পারবে না বা মানুষকে সংযত করতে সক্ষম হবে না। তবুও আপনি যদি চান প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি বর্জন করে আপনার সন্তোষবিধান করব। আপনার অনুবাদে সাহায্য করতে আমি সানন্দে প্রস্তুত। ভারতীয় ভাষায় আমার রচনার অনুবাদ ও প্রচার আমার আনন্দেরই কারণ হবে নিঃসন্দেহ।

আর্থিক লভ্যাংশের কোনো প্রশ্ন এ-জাতীয় ধর্মীয় ব্রতানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না।

আমার সৌভ্রাত্র্যসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে আমি আনন্দিত।

লিও টলস্টয়

৩

৮ মে ১৯১০

প্রিয় বন্ধু,

এইমাত্র আপনার বই *Indian Home Rule* এবং আপনার চিঠি পেলাম।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে আপনার বইখানি পড়েছি— যে প্রশ্ন নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন তা শুধু ভারতের পক্ষেই নয় সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার প্রথম চিঠিখানি খুঁজে পাই নি, কিন্তু Dokeএর লেখা আপনার জীবনী থেকে আপনার সম্বন্ধে জানবার সুযোগ পেয়েছি। বইখানা থেকে আপনাকে আরও ভালোভাবে জানবার ও বোঝবার সুযোগ পেলাম।

আমার শরীর খুব সুস্থ নয়। আপনার বইয়ের প্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্ন ও আপনার কর্মধারার প্রতি আমার আগ্রহ অসীম, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ সব প্রশ্নের আলোচনা করতে পারছি না। আমার শরীর সেরে উঠলে সবিস্তারে লিখব।

আপনার ভাই ও বন্ধু
লিও টলস্টয়

টলস্টয়ের প্রতি গান্ধীজি

৪

21-24, Court Chambers
Johannesburg
15th August, 1910

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ৮ মে তারিখের সৌহার্দ্যপূর্ণ চিঠির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার পুস্তিকা *Indian Home Rule* সম্বন্ধে আপনার অনুমোদন আমার কাছে মহামূল্যবান। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার চিঠিতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেইমতো আপনার সময় হলে আপনার কাছ থেকে বিশদ সমালোচনা আশা করব।

Mr. Kallenbach আপনাকে টলস্টয় ফার্মের কথা লিখেছেন। তিনি আমার বহুকালের বন্ধু। আপনার *My Confession* গ্রন্থে যে সব অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, তার অধিকাংশের ভিতর দিয়েই তিনি জীবনে গিয়েছেন। আপনার লেখার মতো এত অধিক অন্য কিছু তাঁকে প্রভাবিত

করে নি। আপনার নির্দেশিত পথে আরও শক্তি নিয়োগের চেষ্টাস্বরূপ তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর ফার্মের নামের সঙ্গে আপনার নাম যুক্ত করেছেন।

তিনি দয়া করে সত্যাগ্রহীদের ফার্মের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এই সঙ্গে *Indian Opinion*এর যে সংখ্যাগুলি পাঠাচ্ছি তা থেকে এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ পাবেন। বিস্তারিত সংবাদ দিয়ে আপনাকে ভারাক্রান্ত করা আমার পক্ষে অনুচিত। তবু আপনি ট্রান্সভালের সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছেন, সেই কারণেই সাহস পাই।

আপনার একান্ত অনুগত

মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজির প্রতি টলস্টয়

৫

"Kotchety"

[টলস্টয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার ভবন]

7th September, 1910

আপনার *Indian Opinion* পত্রিকা পেয়েছি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে সেই পত্রে প্রকাশিত রচনা পাঠ করে সুখী হয়েছি। এই রচনাগুলি পাঠ করতে করতে আমার মনে যে সব চিন্তা জেগেছে তা আপনাকে জানাতে চাই।

আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যু যতই সন্নিকট হচ্ছে ততই যে সব চিন্তা আমার সত্তাকে প্রতিনিয়ত আলোড়িত করছে তা সাধারণ্যে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করছি। আমার কাছে এসব চিন্তার গুরুত্ব অসীম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তো প্রেমের সহজ অভিব্যক্তি ভিন্ন কিছুই নয়। এই অভিব্যক্তিকে অপব্যাখ্যার দ্বারা বিকৃত করা যাবে না। ভালোবাসা জনহৃদয়ের সান্নিধ্য ও দৃঢ়বন্ধনবাসনার অভিব্যক্তি। প্রেমাকাঙ্ক্ষা জীবনে মহৎ কর্মোদ্যোগের উৎসকে উন্মোচিত করে। যে ভালোবাসা প্রতি মানবের অন্তরে নিত্য অনুভূত তাই মানবজীবনের মহত্তম ও অনন্য বিধান। এর সর্বোত্তম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই শিশুহৃদয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যতদিন পর্যন্ত না সংসারের ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় ততদিন ভালোবাসার অনুভূতি তার অন্তরে জাগরূক থাকে।

ভারতীয় চীন ইহুদী গ্রীক রোমান সব দর্শনে প্রেমের বিধান বর্ণিত আছে। আমার ধারণা যীশুখৃষ্টই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ভালোবাসার মধ্যেই জীবনের মূল নীতি ও প্রাজ্ঞপুরুষের জীবন বিধৃত। শুধু তাই নয় এই নীতির সম্ভাব্য বিকৃতির কথা স্মরণ করে যেসব মানুষ কেবল পার্থিব স্বার্থে জড়িত তাদের কাছে এই নীতির বিকৃতির বিপদ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। প্রধান বিপদ হল স্বার্থরক্ষার জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপের শরণ নিতে সম্মত হওয়া। একেই তিনি বলেছেন চড়ের বদলে চড় মারা বা গায়ের জোরে আমাদের অপহৃত দ্রব্য পুনরুদ্ধার করা! খৃষ্ট জানতেন এবং সকল সৎ মানুষই জানেন যে প্রেম ও হিংসা কখনোই এক সঙ্গে বাস করতে পারে না। তিনি জানতেন একবার একটি উপলক্ষ্যেও হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে প্রেমের আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যাবে, ভালোবাসার আদর্শের

অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ এই খৃষ্টান সমাজ ও সভ্যতা বহিরঙ্গ চাকচিক্য সত্ত্বেও তীব্র একটি অসংগতির মধ্যেই গড়ে উঠেছে। এই অদ্ভুত ও শোচনীয় পরস্পর বিরোধিতা কোথাও সজ্ঞান কোথাও অজ্ঞতাপ্রসূত।

বস্তুতঃ, প্রেমের আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষকে এতটুকু মেনে নিলেই প্রেমভাবের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হতে বাধ্য। এবং প্রেমাদর্শ অপসৃত হলে হিংসানীতি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। হিংসানীতি হল শক্তিমানের অধিকার। বিগত উনিশটা শতাব্দী এই পথে খৃষ্টীয় সমাজ চলে এসেছে। দেখা গিয়েছে মানুষ সর্বদাই সমাজকে সংহত করতে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। তথাপি খৃষ্টীয় জনসংঘ ও অন্যান্য জাতির আদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে। খৃষ্টান ধর্মে প্রেমাদর্শের কথা যত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে অন্য কোনো ধর্মের আদর্শে তা নেই। খৃষ্টান সমাজ এই আদর্শকে নিষ্ঠাসহকারে মেনেও নিয়েছে। যদিও তারাই আবার হিংসার উপর ভিত্তি করে জীবনকে গড়ে তুলেছে এও স্বীকার করতে হয়। ফলে, খৃষ্টান মানুষের জীবনে তাদের কর্ম ও অন্তরে আদর্শের মধ্যে এক চরম বৈপরীত্য প্রকট। প্রেমকে জীবনের ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, আবার একই সঙ্গে শাসকশক্তি বিচারব্যবস্থা বা সামরিক বিভাগের ক্ষেত্রে হিংসাকে অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তার গুণকীর্তনও করা হয়েছে এইখানেই সেই বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য খৃষ্টীয় সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে বেড়েই চলেছে এবং সাম্প্রতিককালে এটি এক ব্যাধির আকারে দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে সমস্যাটি এইভাবে দেখা দিয়েছে— হয় আমাদের মেনে নিতে হবে যে ধর্মীয় বা নৈতিক কোনো বিধানকে আমরা স্বীকার করি না, আমরা জীবনে কেবলমাত্র গায়ের জোরেরই বশীভূত; অন্যথা জোর করে যেসব কর আদায় করা হয় এবং আমাদের বিচারবিভাগ, পুলিশ, সর্বোপরি সেনাবাহিনী এই মুহূর্তে তুলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

সম্প্রতি মস্কোর মেয়েদের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় পরীক্ষায় এক বিশপ-অধ্যাপক মেয়েদের কাছে Ten Commandments সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। বিশেষতঃ ষষ্ঠ নির্দেশ 'হত্যা করিও না'— সম্পর্কে প্রশ্ন করে তিনি যখন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন, তখন বিশপ আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই পবিত্র বিধান অনুযায়ী হত্যা কি সর্ব অবস্থায় পরিত্যাজ্য?' বিকৃতশিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা উত্তর করল, 'না, সব সময় নয়। যুদ্ধে, বা অপরাধীকে শাস্তিদানের সময় হত্যা অনুমোদনযোগ্য!' কিন্তু তাদেরই মধ্যে একটি মেয়েকে সেই প্রশ্ন করা হলে সে আবেগে বিচলিত হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সর্ব অবস্থাতেই হত্যা পাপ।' (আমি যা বর্ণনা দিলাম তা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন)। বিশপ যে সব কৃত্রিম প্রশ্নে অভ্যস্ত তারই জবাবে মেয়েটি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, ওল্ড টেস্টামেন্টে বারবার হত্যা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, এবং স্বয়ং যীশুখৃষ্ট শুধু হত্যাকেই নিষিদ্ধ করেন নি, আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি সর্বপ্রকার অন্যায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।' সেদিন বিশপের সমস্ত আড়ম্বর ও বক্তৃতানৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁকে সেই বালিকাটির কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল।

আমাদের পত্রিকায় আমরা আকাশযাত্রার উন্নতিবিষয়ে আলোচনা করি, নানা আবিষ্কারের কথা বলি, দুরূহ কূটনৈতিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি বা অভিনব শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠি অথচ সেই বালিকাটি যা ব্যক্ত করেছে সে সম্বন্ধে আমরা নীরব। কিন্তু এ নীরবতা আত্মঘাতী। কেননা খৃষ্টীয় সমাজে প্রত্যেকেই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে সেই মেয়েটির মতোই অনুভব করছে। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ, মুক্তিফৌজ, অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, ধনীর বিপুল বিলাস,

দরিদ্রের দুঃসহ কষ্ট, আত্মহত্যার ভয়াবহ সংখ্যাবৃদ্ধি—এ সবই হচ্ছে সেই আন্তর বৈপরীত্যের অভিব্যক্তি। এই আন্তর বৈপরীত্য সর্বত্র প্রকট এবং এর সমাধান সুদূরপরাহত। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই বৈপরীত্য দূরীকরণের একমাত্র পথ প্রেমাদর্শকে স্বীকার করে সর্বপ্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকা। সেই কারণে ট্রান্সভালে আপনাদের সংগ্রাম যদিও আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে তথাপি তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের কার্যাবলী আমাদের কাছে এক অভ্রান্ত বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করেছে যে, এই পথই জগতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পথ এবং এই কাজে শুধু খৃষ্টীয় জাতিপুঞ্জই নয় পৃথিবীর সকল মানুষের যোগ দেওয়া কর্তব্য।

আমার বিশ্বাস আপনি শুনে আনন্দিত হবেন রাশিয়াতেও এই ধরণের এক আন্দোলন গড়ে উঠছে। সেনাবাহিনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি এখানে প্রতি বছর প্রবল হয়ে উঠছে। আপনার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে যোগদানকারীর সংখ্যা বা রাশিয়ায় যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করছে তাদের সংখ্যা যত কমই হোক-না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, 'ঈশ্বর আমাদের পক্ষে' এবং 'ঈশ্বর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান··· ।'

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ
লিও টলস্টয়

অনুবাদক ॥ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষার সুর ও ছন্দ

পুণ্যশ্লোক রায়

১. ইতিহাস

বাংলা ছন্দ নিয়ে এ পর্যন্ত খুব কম আলোচনা হয় নি। যতদূর জানি এ-বিষয়ে প্রথম লেখক J. D. Anderson। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *A Manual of the Bengali Language* বইখানিতে তিনি দেখান যে বাংলায় একটি প্রধান যতি এবং একটি প্রধান ঝোঁক আছে এবং ঝোঁকটা সাধারণত বাক্যের গোড়াতেই পড়ে। উদাহরণ—'উত্তুরে হাওয়া' 'বর্ষাকাল একেবারে'। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর *A Bengali Phonetic Reader* এবং 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বই দুটিতে অ্যাণ্ডারসন সাহেবের থিয়োরিই স্বীকার করে নেন। তবে তাঁর সংগৃহীত উদাহরণের মধ্যে দেখা যায় যে বাংলায় ঝোঁকটা সবসময় গোড়াতেই পড়ে তা নয়, প্রায়ই পড়ে একটা শব্দ ছেড়ে। উদাহরণ—'আমি যেতে পারি নি'। 'তুমি কাল এসো'। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু দেখান যে, প্রশ্ন, অসমাপিকা ও সমাপিকা বাংলায় এই তিন রকম ভাবে বাক্য বা উপবাক্য শেষ হতে পারে। এর পর W. Sutton Page তাঁর *An Introduction to Colloquial Bengali* (১৯৩৪)-তে লক্ষ করেন যে বাক্যের মধ্যে কোনো একটা শব্দের উপর বিশেষ জোর পড়লে তার আরম্ভটা উদারায় নেমে যায়। গদ্যছন্দ নিয়ে এর বেশি কিছু আমার চোখে পড়ে নি।

পদ্যছন্দ নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা হয়েছে। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে দেখান যে বাংলা পদ্যে তিন রকম ছন্দের ব্যবহার আছে। লৌকিক ছন্দে রুদ্ধদলের দৈর্ঘ্যের বাঁধন নেই, কখনো দীর্ঘ কখনো বা হ্রস্ব হতে পারে। উদাহরণ—'শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান'। ("শিব" হ্রস্ব ; "রের" "তিন" "দান" দীর্ঘ)। যৌগিক ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের অন্তে দীর্ঘ ও অন্যত্র হ্রস্ব। উদাহরণ—'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়'। ("দুর" "ভাগ" ও "মঙ্" হ্রস্ব, "দেশ" ও "ময়" দীর্ঘ)। মাত্রিক ছন্দে রুদ্ধদল সর্বত্র দীর্ঘ। উদাহরণ—'ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর'। ("মের" "ঘুম" ও "স্বর" দীর্ঘ। "মের-অ", "ঘুম-অ", "স্বর-অ" পড়লেও ছন্দপতন হয় না ; "ভাঙল" "উঠল" পড়লেও না)।

শ্রীযুত সুকুমার সেন এই তিনটি পদ্যের ছন্দের পুরনো ও বিভিন্ন প্রস্তাবিত নাম বদলে দিয়ে চমৎকার তিনটি নাম ঠিক করে দেন— বলপ্রধান, তানপ্রধান ও মানপ্রধান। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' বইটিতে তিনি দেখান যে তিনটি ছন্দের একটিতে নির্ভর করা হয় তালে তালে আসা ঝোঁকের উপর, অন্যটিতে টানের উপর, অপরটিতে স্বরের পরিমাণের উপর।

শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' বইখানিতে বিচার করে দেখান যে বাংলা ছন্দের মধ্যে একটা দু'য়ের তাল ফোটে। উপরোক্ত তিনপ্রকার ছন্দের কোনোটির বেলা এ নিয়মের অন্যথা হয় না। তবে বলপ্রধানে এর প্রকাশ স্পষ্টতম এবং তানপ্রধানে অস্পষ্টতম। উদাহরণ—'শিবঠা—কুরের। বিয়ে—হল ॥ তিন—কন্যে। দান ॥' 'এদুর—ভাগ্য। দেশ—হতে ॥ হেমঙ—গল। ময় ॥' 'ঘুমের—দেশে। ভাঙিল—ঘুম ॥ উঠিল—কল। স্বর ॥' পদ্যছন্দের আলোচনা আমার জানতে এই পর্যন্ত।

লক্ষ করতে হয় যে গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দ দুয়ের একত্র আলোচনা এপর্যন্ত হয় নি। অবশ্য অবিশ্লেষিত অনুভূতিনির্ভর মন্তব্য যথেষ্ট হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে বাংলার সামগ্রিক ছন্দটার স্বরূপ বিশ্লেষণ।

২. পদ্ধতি

কোনো ভাষার ছন্দ বিচার করতে বসলে কি কি লক্ষ করতে হবে সেটা আগেই বুঝে নেওয়া ভালো। প্রথমে দিঙ্‌নির্ণয়। নিরীক্ষণ করতে হবে চার ধরণের ঘটনার গতি ও সংগতি।

ক. যতিবিচার। প্রথমেই দেখতে হবে যে ছেদ কোথায় কোথায় পড়ছে এবং তা কত ধরণের। প্রত্যেকবার একইভাবে ছেদ পড়ছে এরকম ছেদ ছাড়াও পড়লেও-পড়তে-পারে এই ধরণের ছেদও থাকতে পারে। বাস্তব ছেদ ও সম্ভবপর ছেদেরই কত প্রকার, ছেদের স্থান পরিবর্তন করা যায় কি না এবং বদলালে সঙ্গে সঙ্গে অর্থও বদলায় কি না তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

খ. সুরবিচার। স্বর একঘাটে উদ্গারিত হয় না। (ঙ ন ম ল চারটি ধ্বনিও স্বরধর্মী, কারণ মুখের বা নাসার দ্বার তাদের বেলা মুক্তই থাকে।) সুরের যে ওঠা-পড়া হতে থাকে তার মধ্যে কোনো নিয়ম পাওয়া যায় কি? দুই যতির মাঝখানের অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সুরের ওঠা-পড়া নির্ধারণ করতে কটা ঘাটের প্রয়োজন। তবে কথ্যভাষায় ঘাটগুলি সেতারের মত বাঁধা নয়। পরবর্তী যতিনির্দিষ্ট অংশে সব কটা ঘাট একসঙ্গে নেমে বা একসঙ্গে উঠে যেতে পারে, ঘাটগুলির পারস্পরিক ব্যবধান বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে। ঠিক থাকবে শুধু তাদের সংখ্যা ও উঁচু নীচু ভেদ। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে সুরের গৎ বদলালে অর্থের আভাস বদলায় কি না এবং কয় প্রকার অর্থপূর্ণ নকশা আছে।

গ. বলবিচার। সব স্বর সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ হয় না। কোনোটা বেশি জোর, কোনোটা কম। বল বেশি হলেই যে সুরের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাণও বেশি হবে এটা সব ভাষার বেলা সত্য নাও হতে পারে। বলের মাত্রা বিচার করে এক দুই তিন বা চার অর্থের বদল করে এমন কটা বল আছে দেখতে হবে।

ঘ. সব স্বর সমান দীর্ঘভাবে উচ্চারণ হয় না। এই হ্রস্বদীর্ঘ ভেদের মধ্যে কোনো নিয়ম দেখা যায় কি? এমন হতে পারে যে বিশেষ শব্দের উপর বিশেষ ঝোঁক ছাড়া নিয়মিত দীর্ঘতা দেখা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে ভাষাতেই হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ভিন্নার্থসূচক বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। এমন হতে পারে যে কোনো বিশেষ পরিবেশে, ধরুন রুদ্ধদলে বা একদল শব্দে, স্বর নিয়মিত দীর্ঘ এবং অন্যত্র হ্রস্ব।

কোন্ কোন্ দিকে চোখ ফেলতে হবে এ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চাই যথাযোগ্য পদ্ধতি। পদ্ধতি মূলত দু রকম। বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে রেকর্ড করে যেতে হয় কি বাস্তবিক উচ্চারিত হচ্ছে, কেমনভাবে হচ্ছে, এবং বাস্তবিক কেমন শোনাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে আপনার আমার কান ছাড়াও যন্ত্রপাতির সাহায্য প্রয়োজন। অমন যন্ত্রপাতি আমাদের নেই। সুখের কথা এই যে তার বেশি দূর দরকার নেই। কারণ আমাদের বিশ্লেষণের বস্তু একটা মানবিক শ্রবণনিরপেক্ষ প্রাকৃতিক সত্য নয়। আমরা বিচার করতে বসেছি যা তা আপনি-আমি যা প্রত্যহ হাজার বার গ্রহণ ও প্রস্তাব করছি তারই নিতান্ত মানবিক সত্য। অতএব শ্রেয়

হচ্ছে অতি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের স্বীকৃত তুলনানুগ পদ্ধতি। এর প্রধান প্রক্রিয়া হচ্ছে ধ্বনিতে স্বল্পতম পার্থক্যবিশিষ্ট একজোড়া বাক্য নিয়ে সেই পার্থক্যের সঙ্গে অনুরূপ স্বল্পতম পার্থক্যবিশিষ্ট আর-একজোড়া বাক্যের তুলনা।

৩. যতিবিচার

এদের মধ্যে পার্থক্য কী? 'রোজ আমি ও হাসি ক্লাস থেকে ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে বসে পুতুল খেলি।' এবং 'রোজ আমি ও হাসি ক্লাস থেকে ফিরে এসে পুতুল খেলি আমাদের বাড়িতে বসে।' পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়টাতে "· ·বসে"র পরে একটা যতি পড়ছে, প্রথমটার "· ·বসে"র পর তা পড়ছে না। প্রথম "বসে"র সঙ্গে "খেলি"র যে পার্থক্য, সেটা কি প্রথম "বসে"র থেকে দ্বিতীয় "বসে"র পার্থক্যের সঙ্গে অভিন্ন? তাই তো মনে হচ্ছে। প্রথম "বসে"র পর চালিয়ে যাবার প্রত্যাশা থাকছে, "খেলি" বা দ্বিতীয় "বসে"র বেলা তা থাকছে না। এই যতিটার লেবেল দেওয়া যাক p এবং প্রথম "বসে"র পর যা ঘটছে তার লেবেল দেওয়া যাক q। এইভাবে তুলনা করে করে এগলে দেখব যে প্রথম বাক্যটাতে q পড়ছে "রোজ" "হাসি" "এসে" এবং "বসে"র পরে আর p পড়ছে "খেলি"র পরে। বাংলায় তা হলে অন্তত দু-ধরণের যতি আছে। একের জায়গায় অন্যের প্রয়োগ অর্থ বদলে দেয়।

কিন্তু দুটোতেই ইতি নয়। "আপনি এলেন?" আর "আপনি এলেন।" তুলনা করে দেখলে মনে হবে p, q ছাড়া r নামে আর-একটা যতি বাংলা ভাষায় সম্ভব এবং সেটা প্রথম বাক্যটাতে শোনা যাচ্ছে। "রাম ছাত্র?" আর "রাম ছাত্র।" এই জোড়াতেও সেই প্রভেদ। অর্থের তফাত তো স্পষ্ট। তা হলে কি যতি তিনটে? একটু যত্ন করে "রোজ" এবং "হাসি"র মধ্যে তুলনা করলে বোঝা যায় ধ্বনির একটা পার্থক্য আছে। "রোজ" এবং প্রথম বাক্যের "বসে"র মধ্যেও সেই একই পার্থক্য। "রোজ" আর "এসে"র পরে যে ধ্বনি, "হাসি" আর "বসে" র পরে যে ধ্বনি— তারা এক নয়। দ্বিতীয়টিকে যদি q বলি, প্রথমটিকে s বলে তার থেকে আলাদা করতে হবে। অর্থের পার্থক্য এ ক্ষেত্রে সামান্য। sএর বেলা ঝোঁকটা যেন বেশি। তা ছাড়া আরও বাক্যের সঙ্গে তুলনা করে করে দেখলে বোঝা যাবে যে পর পর দুটো q আসে না, শেষেরটা থেকে গুনলে দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ স্থানে qএর স্থানে s পড়ে। বাহুল্যভয়ে প্রমাণ স্থগিত রাখলাম।

তা হলে কি চারটে যতি আছে বাংলা ভাষায়? সন্দেহ হচ্ছে এতগুলো যতি যতিই নয়, অন্য কিছু। আর-একদিকে তুলনা করলে এ সন্দেহটা যে ভিত্তিহীন নয় তা প্রমাণ হবে। "আমি ও হাসি" "ক্লাস থেকে ফিরে এসে" এবং "পুতুল খেলি," বাক্যাংশগুলো তুলনা করা যাক। "থেকে"র পর যে ছেদ পড়ছে, তা "হাসি" "এসে" বা "খেলি"র পর যা যা পড়ছে তার কোনোটার সঙ্গেই অভিন্ন নয়। "থেকে"র পরের ছেদ "আমিও"র পরেকার ছেদের সঙ্গে অভিন্ন। "পুতুল"এর পরের ছেদের সঙ্গেও। এ ছেদের উপর থামা সম্ভব নয়; থামতে গেলেই তার জায়গায় এসে পড়বে p q r s-এর কোনো একটি।

তা হলে বাংলায় সত্যিকার ছেদ আছে মাত্র দুটোই। একটাকে বলা যেতে পারে যতি, তার উপর থামা যায়। অন্যটার নাম দেওয়া যাক উপযতি, তার উপর থামা যায় না। প্রথমটা দেখানো

যাক ± চিহ্ন দিয়ে, দ্বিতীয়টা + চিহ্ন দিয়ে। p q r s-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা যতির যতিত্বে নয়। যতিতে পৌছবার প্রস্তুতি বা আক্রমে। এদের পার্থক্য স্থর, বল বা দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত।

৪. স্থরবিচার.

উপরোক্ত p q r s-এর পারস্পরিক পার্থক্য স্থরগত কি না পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। r-এ যেতে স্থর চড়ে গিয়ে যতিতে পড়ছে এবং p-তে স্থর নেমে গিয়ে যতিতে পড়ছে এ পার্থক্য ধরা বোধ হয় সব চেয়ে সোজা। ব্যাপারটা দুটো লাইন এঁকে দেখানো যেতে পারে। r হচ্ছে —/± এবং p হচ্ছে —\\± । এর পর বিচার করে শুনলে দেখানো যাবে q-এর রূপ হচ্ছে —±

(অর্থাৎ স্থর সমানভাবে যতিতে পড়ছে) এবং s-এর রূপ —\\/± (অর্থাৎ স্থর একটু নেমে ফের চড়ে গিয়ে যতিতে পড়ছে)।

এর পর বিচার করা যাক অন্য পরিবেশে স্থরের উঠাপড়া কিরকম হয়। যতি ±এর অব্যবহিত পরে কি স্থরের আক্রম একরকমই ? "আমি ও হাসি"র আরম্ভ আর "পুতুল খেলি"র আরম্ভ এ দুয়ের মধ্যে কি পার্থক্য নেই একটা ? ঠিক সেই পার্থক্যই কি শোনা যায় না—"বর্ষাকাল" আর "রবীন্দ্রনাথ" এ দুই শব্দে। একটাতে আক্রমের রূপ সমান ±—, অন্যটাতে উপক্রমের রূপ ±/— ।

তার পর দেখা যাক +এর দুই পাশ। +এর পরে স্থরের আক্রম সাধারণত সমান + —, কিন্তু "বর্ষাকাল একেবারে" বাক্যটাতে তার রূপ +_ । +এর আগে তিনরকম আক্রম শোনা যায়। "ক্লাস থেকে ফিরে এল" একটানাভাবে বলে গেলে —+ এর ধ্বনিটা শোনা যায়। কিন্তু সামান্যমাত্র জোর দিলেই যেরকম শোনা যায় তার চিত্র হবে _/+ । এবং "কখনো আসেনি।" প্রথম শব্দটার উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে যা শোনা যায় তার রূপ —^+ ।

এই আক্রমগুলি একত্রভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের সংখ্যা মূলত ৬এর বেশি নয়। সমান •—• , উত্তারিত সমান •• , উঠতি ./. , উত্তারিত উঠতি •/• , পড়তি •\\• , উত্তোলিত পড়তি .\\. । ঘাটের হিসেবে এদের দেখাতে হলে তিনটে ঘাট দরকার হবে। তাদের 1, 2, 3 (উদারা, মুদারা, তারা) নাম দেওয়া যেতে পারে। সে হিসেবে আক্রমগুলির রূপ হচ্ছে 22, 11, 23, 12, 21, 32.।

এর পর প্রশ্ন, বিস্ময়, আদেশ, অনুরোধ, আপত্তি, সম্মতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বেশ কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়ে শোনা যেতে পারে পদের স্থরের গৎগুলো কিরকম। আমি ১২টার বেশি ছক পাইনি। তালিকা ও উদাহরণ দিচ্ছি। ব্র্যাকেটের অংশ নাও উপস্থিত থাকতে পারে।

±(−−+)−/± বা ±(22−22+) 22−23±। এর প্রয়োগ প্রশ্নে, যদি প্রশ্নবাচক কোনো সর্বনাম আগে না থাকে। উদাহরণ ± আপনি + এলেন ? ±

±(−−+)−\\± বা ±(22−22+)22−23±। এর প্রয়োগ উত্তর, মন্তব্য বা আদেশে। উদাহরণ—± ক্লাস থেকে + ফিরে এল।±

±(−/+)−−± বা ±(11−12+) 22−22± এবং

±(−/+)−/± বা ±(11−12+) 22−12± দুয়ের প্রয়োগ প্রায় একরকম। প্রথমটার প্রয়োগ পরপর দুবার হয় না, দ্বিতীয়টার সঙ্গে পরাবর্তন করতে হয়। একটু ঝোঁক পড়লেই প্রথমটার বদলে দ্বিতীয়টা শোনা যায়। উভয়েরই প্রয়োগবাক্য যে অসম্পূর্ণ, আরও যে বলবার কিছু আছে তা বোঝাতে। উদাহরণ— ± ক্লাস থেকে + ফিরে এসে ±

±/+−± বা ±23+22±। এর প্রয়োগ বিস্ময়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ প্রকাশে। উদাহরণ—
(± ধরতে ±) পারে + না ! ±
(±এটা ±) কী + করল ! ± ± পাচ্ছি + না। ±

±−−+__ বা ±22−22+11−11±। এর প্রয়োগ নিশ্চিতি জানাতে। উদাহরণ (±এতো ±) বর্ষাকাল + একেবারে ±

±−\\+−\\± বা ±22−32+22−21। এর প্রয়োগ প্রশ্নসূচক সর্বনামসমেত প্রশ্নে ও বিশেষ ঝোঁক-সমেত মন্তব্যে। উদাহরণ—+ কোন্‌খানে + গেছলে ?± ± কখনো + আসেনি। ±

±_/+/± বা ±11−12+22−23±। এর প্রয়োগ বিশেষ ঝোঁকসম্পন্ন প্রশ্নে, যদি প্রশ্নসূচক সর্বনাম না থাকে। উদাহরণ—± ভালো + তো ? ±

±/−+−−± বা ± 12−22+22−22
±/−+−/± বা ± 12−22+22−12
±/−+−/± বা ± 12−22+22−23
±/−+−\\± বা ± 12−22+22−21±। এদের প্রয়োগ উপরোক্তদের অনুরূপ। পার্থক্য এই যে এরা সমাস বা ফ্রেজ চিনিয়ে দেয়। উদাহরণ—±পুতুল + খেলি।± ± রবীন্দ্র + জীবনী ? ±

৫. বলবিচার

বাংলা শব্দে কোথায় বল পড়বে তা ঠিক করা থাকে না। ইংরেজিতে con'test একটা ক্রিয়াপদ, 'contest একটা বিশেষ্য। বাংলায় তার কোনো তুলনা নেই। বাংলা শব্দের বল নির্ভর করে স্বরের ছকে তার স্থানের উপর। ছকের মধ্যে বলের বিতরণের নিয়ম একটা দাঁড় করানো যায়। বল হচ্ছে আগের দিকে এবং উপরের দিকে। ± − − + − / ± বা ± 22−22 + 22−23 ± ছকটাতে বল বেশি প্রথম ± এর পরে এবং দ্বিতীয় ± এর আগে। + এর পরেও অল্প বল পড়ছে। + এর আগে সবচেয়ে কম বল। ± / − + − \ + বা ± ।2−22+22−2। ± ছকটাতে সবচেয়ে বল পড়ছে প্রথম 2-টাতে ("পুতুল খেলি" এর "তুল" দলটাতে।) + এর পরের প্রথম 2-তেও কিছু বল পড়ছে। অন্যত্র বল নেই। বাংলায় বলবিন্যাস স্বরনির্ভর।

বাংলায় বলবিন্যাসের একটা বিচিত্র প্রমাণ পাওয়া যায় শব্দের সংক্ষেপনধারা পর্যালোচনা করলে। দ্রুত কথনে "খাটুনি" হয়ে যায় "খাটনি", "বাঁকুড়া" হয় "বাঁক্ড়ো", "পড়ুয়া" হয় "পোড়ো", "ঠাকুরানী" হয় "ঠাকরান" বা "ঠাকরুন"। লিখনে স্বীকৃতি পায়না এমন সংক্ষেপনের উদাহরণে "ভবানীপুর" হয় "ভনিপুর", "রবীন্দ্রনাথ" হয় "রইন্নাত", "জামাইবাবু" হয় "জাঁইউ"। বলহীন দল দ্রুত কথনে প্রায়ই হারিয়ে যায় সামান্য চিহ্নও না রেখেই।

৬. দৈর্ঘ্যবিচার

বাংলা শব্দে কোথায় স্বরটা দীর্ঘ হবে তা ঠিক করা থাকে না। সংস্কৃত বা ইংরেজিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য আছে। "দিন" আর "দীন" একদিকে, bit, beat আর-একদিকে এই নিয়মের উদাহরণ। অনুরূপ পার্থক্য বাংলায় নেই। "দিন" আর "দীন" এর বাংলা উচ্চারণে কোনো ধ্বনিগত ভেদ নিয়মিতভাবে শোনা যায় না। তাই বলে কি দীর্ঘ স্বর কোথাও শোনা যায় না?

দীর্ঘ স্বর খুঁজতে বসলে "রোজ আমি ও হাসি· ·খেলি।" বাক্যটাতে তা বেশ কয়েক জায়গায় শোনা যায়। "রোজ" দলটিতে স্বর দীর্ঘ। "ক্লাস" দলটিতে এক-একবারে দীর্ঘ স্বর আসে, এক-একবার হ্রস্ব, "দের" দলটিতেও তাই, "তুল" দলটিও তাই। একটু ঝোঁক দিয়ে বললেই এগুলি দীর্ঘ, হালকাভাবে বললে হ্রস্ব। আরো উদাহরণ নেওয়া যাক। "পা" আলাদা বললে দীর্ঘ, "পা'টা" বলতে "পা" দলটি এমনিতে হ্রস্ব কিন্তু ঝোঁক পড়লে দীর্ঘ। আরও কিছু উদাহরণ নিয়ে বিচার করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে গতের মধ্যে তার স্থানের উপর। একলা একদল শব্দ, অর্থাৎ ± এবং + বা + এবং ± বা + এর অবর্তমানে ± এবং ± এর মধ্যবর্তীস্থানে একদল শব্দের স্বর সর্বদা দীর্ঘ। এ ছাড়া যে দলটাতে বল পড়ছে তার স্বর নিয়মিতভাবে দীর্ঘ না হলেও তাকে দীর্ঘ করা যায়। অন্যান্য স্থানের স্বর নিয়মিতভাবে হ্রস্ব, তাদের দীর্ঘ করা যায় না, যদি না সমস্ত বাক্যের গড়ন ও গৎ বদলে দেওয়া হয়।

এইসঙ্গে আর-একটা প্রশ্ন ওঠে। দুটি যতির মধ্যে ক'টি দল পড়তে পারে? প্রশ্নটা ঠিক নিখুঁত হল না। কারণ দুই যতির মধ্যে একটি উপযতি থাকলে সমগ্র গৎটা দ্বিগুণ বড় হবে এবং কোনো

বিশেষ দলের স্বর দীর্ঘ হতে পারে। যতি ও উপযতির বা উপযতি না থাকলে দুই যতির মধ্যবর্তী অংশটার নাম দেওয়া যাক উপগৎ এবং হ্রস্ব স্বরে দৈর্ঘ্যের পরিমাণকে এক মাত্রা বলে ধরা যাক। এবার প্রশ্নটা দাঁড়াবে একটি উপগতে ক'টি মাত্রা থাকতে পারে? "রোজ" দুই মাত্রা, "ক্লাস থেকে" বা "আমাদের" তিন মাত্রা, "ফিরে এসে" চার মাত্রা, "বাড়িতে বসে" পাঁচ মাত্রা, "বাড়িতে বসিয়ে" যদি বলি তা হবে ছয় মাত্রা। লক্ষ করলে অমূল্যবাবুর থিয়োরিটার সত্যতা স্বীকার করতেই হবে যে এদের মধ্যে একটা দু'য়ের তাল ফুটে উঠছে। দুই যেন।—।, তিন যেন ॥—। বা।—॥, চার যেন ॥—॥, পাঁচ যেন ।॥—॥ বা ॥—।॥, ছয় যেন ।॥—।॥ প্রতীত হচ্ছে। মাত্রাগুলির ঝোঁকদুটির মাঝখানে উপযতির চেয়েও ছোট যে ছাড় আছে তার নাম দেওয়া যাক ভাজক।

৭. পদ্যের ছন্দ

সকলেই জানেন যে বাংলায় তিনপ্রকার পদ্যছন্দ। বলপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল ইচ্ছামত হ্রস্ব বা দীর্ঘ। তানপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল শব্দের অন্তে হলে দীর্ঘ, অন্যত্র হ্রস্ব। মানপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল সর্বত্র দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তিনটি নিয়মই কৃত্রিম। কিন্তু কৃত্রিমতা না মানলে তো পদ্যের বাঁধন আসবে না। তাছাড়া প্রথমটাতে যে নাচের এবং দ্বিতীয়টাতে যে গানের আমেজ পাওয়া যায় তা বলপ্রধান ও তানপ্রধান নাম দুটোতেই প্রকাশ হচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে সেই অনুভূতিলব্ধ নাম দুটোর যথার্থতা কতদূর বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বলপ্রধান ছন্দের নমুনা "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।" সুরের ওঠাপড়া বিচার করলে এর ছক হবে

± — ± — ± — ± – ± — ± — ± — ± ╲ ± । নমুনাটাতে "বর্" ও "ধান" দীর্ঘ এবং উপগতের ছক ॥—।॥ তাল। সামনের দিকেই ঝোঁক পড়ছে, কারণ তার পরে আর উচ্চতর ঘাট কোথাও ছোঁওয়া হচ্ছে না। "বিষ্টি পড়ে" উদাহরণটা নিলাম না এই কারণে যে কেউ কেউ ওটা তানপ্রধান ছন্দে পড়েন, যদিও ওটা বলপ্রধান ছন্দেই পড়া উচিত। বলপ্রধান ছন্দে পড়লে "বিষ্টি পড়ে"র গৎ একই, কিন্তু উপগতের ছক ॥—॥ তাল।

তানপ্রধান ছন্দের নমুনা—"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।" গৎ

± ╱— + ╱— + ╱— + - ± ╱— + ╱— + ╱— + ╲ ± । এর উপগতের ছক ॥—॥ তাল।

লক্ষ করতে হবে যে যতির প্রয়োগ পংক্তির ভিতরে কোথাও নেই। বল পড়ছে প্রত্যেক উপগতের দ্বিতীয় এবং শেষ উপগতের প্রথম দলটিতে। "দুর্"এর উপর একটা ঝোঁক যে পড়ছে তাতে কোনো ভুল নেই। "মঙ্", "ব", "ময়" এবং "ভয়" এর উপরও ঝোঁক পড়ছে: "দেশ", "দূর" এবং "দাও" এর বেলা উচ্চারণ দুই মাত্রার হচ্ছে এবং ঝোঁক পড়ছে দ্বিতীয় মাত্রাটির উপর। আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। "ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী, একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।" এতে ঝোঁক পড়ছে প্রত্যেক দ্বিতীয় দলে এবং পঙ্‌ক্তিশেষে "টনী" আর "প" র উপর। এ ছন্দে গানের রেশ আসে সামনের থেকে ঝোঁকটা সরিয়ে দেওয়া এবং যতির বদলে উপযতির প্রয়োগ এই দুই কৌশলে।

মানপ্রধান ছন্দের নমুনা— "ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর, গাছের শাখে জাগিল পাখি কুসুমে মধুকর।" এর গৎ ± /— + — ± /— + — ± /— + — ± /— + \ ± । এর উপগতের ছক ॥।-॥ তাল। লক্ষ করতে হয় যে যতি ও উপযতি এবং তাদের পরে সমান আক্রম ও উঠতি আক্রমের পরাবর্তন। আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। "হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল, অবিচ্ছিন্ন চলে নিরবধি।" এর গৎ ± — + /— ± /— + — +/— ± /— + — ± — + /— ± । অবিরল, এর উপগতের ছক প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তির গোড়ার দুটোতে।—। তাল, অন্যগুলোতে ॥—॥ তাল। এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মানপ্রধান ছন্দের অতুলনীয় ঐশ্বর্য।

৯. উপসংহার

বাংলা ভাষায় গদ্যের ও পদ্যের যে ছন্দ তার রূপাবলী নির্ণয় করতে গিয়ে ১০টি পৃথক উপাদান স্বীকার করতে হয়। এদের তালিকা দিচ্ছি—

যতি ±
উপযতি +
ভাজক —
মাত্রা ।
সমান আক্রম •—• বা 22
উত্তারিত সমান আক্রম ⠒ বা 11
উঠতি আক্রম ./. বা 23
উত্তারিত উঠতি আক্রম ••/• বা 12
পড়তি আক্রম ••\ বা 21
উত্তোলিত পড়তি আক্রম ,\. বা 32

গীতবিতানের ভূমিকা

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
        প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
        শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে ॥
এসো এসো সেই নবসৃষ্টির কবি
নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি—
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির স্নানের কালে,
        আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে ॥
সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসংগীতে
        যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
        বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহ ব্যথা যে হানে
        বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
                দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গানটি মীড়-প্রধান ॥ মধ্যলয়ে গেয়

II ন্‌সা সা সা । রা রা রা I রা রা রা । রা রা -সা I
প্র০ থ ম যু গে র উ দ য় দি গ ঙ্‌

                    ॥
I রা মজ্ঞা -া । -া -া -মা I মা মপা পা । পা পা ধা I
গ নে০ ০ ০ • ০ প্র থ০ ম দি নে র

I মপা^ম মা -জ্ঞা । -া -া -মা I মা পা -া । পধা পা -ধা I
উ৹ ষা ০ ০ ০ ০ নে মে ০ এ৹ ল ০

I মা পা -া । -া -া -া I মা মণা ণা । ণা ধা ণা I
য বে ০ ০ ০ ০ প্র কা৹ শ পি য়া সী

I ধা ধা -ণা । ধা -া -ণা I ধা পা -ধা । মা পা -ধা I
ধ রি ০ ত্রী ০ ০ ব নে ০ ব নে ০

I মা পা পধা । মা -পধা ^ধপা I মা -জ্ঞা -া । -া -া -া I
শু ধা য়ে৹ ফি ৹৹ রি ল ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞা -মা মা । ^জ্ঞমা রা সা I রা সা -া । -া -া -রা II
স্ র্ খুঁ জে পা বে ক বে ০ ০ ০ ০

-া II {মা পা -া । পা না -া I -া -া -া । -পা না -া I
০ এ সো ০ এ সো ০ ০ ০ ০ ০ সে ই

I না র্সা না । -র্সা র্রা ^র্রর্সা I না ^র্রর্সা -ণা । ধা ণা -া I
ন ব স্ ষ্ টি র ক বি ০ ন ব ০

I ধা ণা ধা । ণা ধা ণা I ধা ধা -ণা । ধা -পা পণা I
জা গ র ণ যু গ প্র ভা ০ তে ০ র৹

I ধা পা -া । -া -া -া} I মা -া -ণা । ধা ধা -ণা I
র বি ০ ০ ০ ০ গা ০ ন্ এ নে ০

I ধা ধা -ণা । ধা পা -ধা I মা -া -পা । পধা ^ধপা -া I
ছি লে ০ ন ব ০ ছ ০ ন্ দে৹ র ০

I মপা^ম মা -জ্ঞা । -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I
তা॰ লে ॰ ॰ ॰ ॰ ত॰ রু ণী উ ষা র

I সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞরা মজ্ঞা -া । -া -া -া I
শি॰ শি র স্না নে র কা॰ লে॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I জ্ঞা পা পা । পা পা -ধপা I মা মা -া । ^মজ্ঞা রা -জ্ঞা I
আ লো আঁ ধা রে ॰র্ আ ন ন্ দ বি ॰

I রা সা -া । -া -ন্া -া II
প্র বে ॰ ॰ ॰ ॰

-া II মা পা -া । পা না পা I পা না না । না র্সা র্রর্সা I
॰ সে গা ন্ আ জি ও না না রা গ রা গি॰

I না র্সা -া । -া -ণা -া I ধা ধা -ণা । ধা ধা ণা I
ণী তে ॰ ॰ ॰ ॰ শু না ও তা হা রে

I ধা ধণা ধা । ধপা পা -ধা I মপা^ম মা -জ্ঞা । {জ্ঞা -া -রসা I
আ গ॰ ম নী॰ স ঙ্ গী॰ তে ॰ যে ॰ ॰॰

I সা -া -রা । রা -মমা -জ্ঞা I রা সা -া । -সা -রা -ন্া I
জা ॰ ॰ গা ॰॰ য়্ চো খে ॰ ॰ ॰ ॰

I ন্া সা সা । রা রা পা I মপা^ম মা -জ্ঞা} । -া -া -া I
নূ ত ন দে খা র দে॰ খা ॰ ॰ ॰ ॰

I {সগা গা গা । গা গা -সা I সা গা গা । মা পা ধপা I
যে॰ এ সে দাঁ ড়া য়্ ব্যা কু লি ত ধ র॰

I মগা মা -া । -া -া -া I মগা মপা পমা । পমা মা -জ্ঞা I
নী॰ তে ॰ ॰ ॰ ॰ ব॰ ন॰ নী॰ লি॰ মা র্

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরসা । সা সমা মজ্ঞা I রা সা -া । -া -া (-া)} I -গা I
পে ল ব॰॰ সী মা॰ না টি তে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I মা পা পা । পা পা -ণা I ণা ণা ণধা । পা -ধণা ণা I
ব হু জ ন তা র্ মা ঝে অ॰ পূ ॰র্ ব

I ণধা পা -া । -া -া -ধপা I মা মগা গা । -া গা সা I
এ কা ॰ ॰ ॰ ॰॰ যে জা॰ গা য়্ চো খে

I সা গা গা । মা পা ধপা I মগা মা -া । -া -া -া I
নূ ত ন দে খা র॰ দে॰ খা ॰ ॰ ॰ ॰

I {মা পা -া । পা না পা I পা না না । না র্সা র্রর্সা I
অ বা ক্ আ লো র লি পি যে ব হি য়া॰

I না র্সা -া । -ণা -া -া I ণা ধা ণা । ধা -ধা ণা I
আ নে ॰ ॰ ॰ ॰ নি ভৃ ত প্র হ রে

I ধা ধা ণা । ধা পা পণা I ণধা পা -া । -া -া -া} I
ক বি র চ কি ত॰ প্রা ণে ॰ ॰ ॰ ॰

I {র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্রা র্রমা র্জ্ঞা । র্রা র্সা র্রর্সা I
ন॰ ব প রি চ য়ে বি র॰ হ ব্য থা যে॰

I না র্সা -া । -া -া -া} I সা -া রা । রা রা রসা I
হা নে ॰ ॰ ॰ ॰ বি ॰ হ্ব ল প্রা ন্তে॰

I রা -া রা । রসা রা -পা I মপা মা -জ্ঞা । -া -া -া I
স ঙ্ গী তং সো উ রং ভে ০ ০ ০ ০

I মা -পা পা । পা পা -ণা I ণা ণা ণা । ধা পা -ধণা I
দূ র্ আ কা শে র্ অ রু ণি ম উ ৎ

I ধা পা -া । -া -া -সা II II
স বে ০ ০ ০ ০

স্বীকৃতি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রখানি শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে মুদ্রিত।
মূর্ছিতা শ্রীরাধা চিত্রের ব্লক প্রবাসী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুদ্রিত।

সংশোধন: পৃ ১১১ - ১২৪ স্থলে পৃ ৩১১ - ৩২৪ হবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

ষোড়শ বর্ষ। শ্রাবণ ১৮৮১ - আষাঢ় ১৮৮২ শক

বিষয়সূচী

নিম-এর তুলনা নেই

এ কথা সর্বজনবিদিত যে আয়ুর্বেদের প্রথম যুগ থেকেই ঔষধ হিসেবে নিমের ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে এবং অথর্ব বেদে। নিমের দ্রব্যগুণ অত্যাশ্চর্য ; নিমের পাতা, ফুল, বীজ, তেল, ডাল ও ছাল প্রতিটি অংশের হিতকারী গুণাবলী মহামতি চরক ও সুশ্রুত তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

নিমের পচন-নিবারক, বিষাপহারক, সঙ্কোচ-সাধক ও দুর্গন্ধ-নাশক গুণাবলীর সঙ্গে আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকারী ঔষধাদির সমন্বয়ের ফলেই 'নিম টুথ পেষ্ট' আজ দন্ত-মঞ্জন হিসেবে অদ্বিতীয়।

এই সব বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য 'নিম টুথ পেষ্ট'-এর সঙ্গে অন্য কোন টুথ পেষ্টের তুলনাই চলে না।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

NTP-193 B